সোনার চেয়ে দামী

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা

হারটি গ্রাস করে নি, জলজ্যান্ত জিনিষটা বাক্সে তোলা আছে তবু এরকম অন্যায় কথা সকলে ভাববে কেন?

এটাই বড় প্রাণে লাগে।

ললিতার মত যারা একনজর তাকিয়েই বলে, একি, গলা খালি যে?

তারা বাঁচিয়ে দেয় সাধনাকে।

বলা যায়, আর বলিস কেন ভাই!

গয়নাটার কি হয়েছে শোনানো যায়। সহরের নামকরা মস্ত জুয়েলারি দোকান একগাদা মজুরি নিয়ে কি ছাইয়ের গয়নাই গড়িয়ে দিয়েছিল, তিনটা বছর টিকল না?

কি দশা হয়েছে ছাখ্।

বলে, জিনিষটা বার করে দেখানোও যায়। প্রত্যক্ষ অকাট্য প্রমাণ যে স্বামী বেকার বটে তবু হারটা তার বজায় আছে।

কিন্তু সবাই তো এরকম সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে না।

শোভার মা বার বার গলার দিকে তাকায় কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলে না।

অতিষ্ঠ হয়ে যেচে তাকে গয়নাটা বার করে শোভার মার হাতে দিয়ে বলতে হয়, মাসীমা, দেখুন তো কিজন্য এমন হল? এত নামকরা দোকানের জিনিষ এমনভাবে খসে খসে গেল কেন? প্যাটার্ণটার জন্যে না সোণাই খারাপ?

বেলা আসে। ছেলেবেলার বন্ধু বেলা। গলার দিকে

চেয়ে বলে, পাঁচটা টাকা চাইব ভেবেছিলাম ! তা বুঝতেই পারছি তোকে কে দেয় ঠিক নেই।

সাধনা ম্লান হেসে বলে, এ আর বোঝা কঠিন কি ?

সাধনা অপেক্ষা করে। বেলা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে কিভাবে কেন হারটা গেল কি বৃত্তান্ত। ভদ্রতা বাঁচিয়ে কথাটা এড়িয়ে যাবার সম্পর্ক তার সঙ্গে বেলার নয়।

কিন্তু বেলাও এড়িয়ে যেতে চায় কথাটা !

অগত্যা তাকেই যেচে বলতে হয়, গলার হারটা—

বেলা সঙ্গে সঙ্গে বলে, থাক্না ভাই, শুনতে চাই না। আমি জানি।

: শোন্ না কথাটা।

: না না, আমি শুনব না। জানা কথা আবার শুনব কি ? তোকে বলতে হবে না।

: একটা পরামর্শ চাইছি।

: পরামর্শ ?

সাধনা হারটা বার করে। বলে, মেরামত করব, না নতুন করে গড়াব ? কোথায় দেব বল্‌তো ? ওই বড় দোকানেই দেব, না সাধারণ স্যাকরার কাছে দেব ? বড় দোকানে সত্যি আর আমার বিশ্বাস নেই।

বেলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, হারটা তবে বেচিস নি !

সাধনাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, না।

কিন্তু এভাবে মুখ রাখা যায় কত জনের কাছে ? যেচে

যেচে কতজনকে কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়? তার কি আর কাজ নেই, ঝনঝাট নেই, দুর্ভাবনা নেই। এর চেয়ে একটা কাগজে লিখে গায়ে এঁটে রাখাই সোজা—গয়ণা আমার বিক্রী হয় নি গো, তোমরা যা ভাবছ সত্যি নয়!

কিন্তু কেন এই অস্বস্তি? এই লজ্জাবোধ? এত তার খারাপ লাগবে কেন? একথাও সাধনা ভাবে।

গুণহীন অপদার্থ মানুষ তো রাখাল নয়। নিজের খেয়াল খুসীতে সে তো বেকারত্ব বরণ করে ঘরে বসে নেই। বাপের জমিদারি বা নিজের যথা সর্ব্বস্ব বদখেয়ালে উড়িয়ে দিয়ে সে তো এই দুরবস্থা ডেকে আনে নি। খাটতে সে অরাজী নয়। যেমন প্রাণপণে খেটে কলেজে সে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল তেমনি মন দিয়ে প্রাণপণে খেটে সে করে যাচ্ছিল অফিসের কাজ। বিনা দোষে ছাঁটাই হওয়ার জন্য সে তো দায়ী হতে পারে না। অলস হয়ে সে বসেও নেই। কাজের খোঁজে ঘোরাটাই তার দাঁড়িয়ে গেছে প্রাণান্তকর খাটুনিতে, সেই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া তিনটে টিউসনি। এত চেষ্টা করেও কাজ না পেয়ে হারটা যদি নিরুপায় হয়ে বেচেই দিয়ে থাকে রাখাল, দশজনে কি ভাবছে ভেবে তার এত খারাপ লাগার কি আছে?

আজ তো সকলেরই এরকম দুরবস্থা। নিছক পেটের জন্য আর একেবারে উলঙ্গ হওয়া ঠেকাবার জন্য কত লোকে শেষ সম্বলটুকুও বেচে দিচ্ছে। তারাও নয় সেই দলে ভিড়েছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক।

হারটা এখনো অভাবের গ্রাসে যায় নি। কিন্তু গেলেও খাপছাড়া ব্যাপার হত না কিছুই। দশজনে যদি ধরেই নেয় যে তাই ঘটেছে, সে কেন এত বিচলিত হয় ?

যা খুসী ভাবুক না দশজনে !

কিন্তু এত ভেবেও মনে জোর পায়না কিছুতেই। কোন মতেই সে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারে না যে দশজনে মিথ্যা করে তার স্বামীকে তার গলার: হারটা বেচে দেবার অপরাধে অপরাধী ভাবছে।

কোথায় যেন বড় একটা ফাঁকি রয়ে গেছে জীবনে। শাড়ী গয়না দিয়ে দশজনের কাছে বড়লোক সাজবে, স্বামী সোহাগিনী সাজবে—এ চিন্তাটাও আজ হাস্যকর হয়ে গেছে। সকলের সঙ্গে অতল ফাঁকিতে হাবুডুবু খেতে খেতে এসব ছেলেমানুষী ফাঁকির খেলায় আর মন মজে না, সারা গায়ে গয়না চাপানো বাসন্তীকে দেখলে শুধু হাসি পায় না, গাও যেন ঘিন ঘিন করে। অথচ রাখাল তার গলা খালি করে হারটা বেচে দিয়েছে—দশজনের এই ভুল ধারণাটা অসহ্য ঠেকছে তার। খালি গলার দিকে মানুষ নজর দিলে বিশ্রী লাগার সীমা থাকছে না।

হাতে শুধু শাঁখা পরে ভোলার মা পাঁচ বছরের ছেলেকে সাথে নিয়ে ডিম বেচতে আসে, সে নজর দিলে পর্য্যন্ত !

একতলাটা দু'ভাগ করা। ওপাশের ভাগটা সম্পূর্ণ

বাসন্তীদের দখলে। এপাশে একখানা ঘরে সাধনা থাকে,—অন্য ঘর দু'খানা আশাদের। তার স্বামী সঞ্জীব ভাল চাকরী করে।

ছোটখাট হলেও এভাগের যেটা রান্নাঘর, আগে সাধনাই সেখানে রাঁধত। এখন আশাকে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে তাদের ভাড়া কমেছে সাত টাকা।

ভাগের দেয়ালে লাগানো তার ঘর। টিনের চালার কলঘরটার মধ্যে একটু সরু ফাঁক, ঘরে যাতায়াতের জন্য। এই ফাঁকের কোণটা ঢেকে নিয়ে সাধনা রান্না করে। উনানের ধোঁয়া আর রান্নার ঝাঁঝ জানালা দিয়ে ঘরে যায়, বসে রাধতে রাঁধতে মনে হয় ঘরের দেয়াল আর কলঘরের দেয়াল বুঝি গায়ে ঠেকছে দু'দিক থেকেই।

বাসন্তী এসে বলে, কি রাঁধছেন ভাই। লাউ খোসার ছেঁচকি? আঃ, কি সুন্দর যে লাগে! আমি কখনো ফেলি নে। চিংড়ি দিয়ে মুগডাল ভেজে লাউ রাঁধি, তার চেয়ে ভাল লাগে খোসার ছেঁচকি!

সাধনার চেয়ে দু'চার বছর বেশীই হবে বয়স। একটু বেঁটে, সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট ও স্পষ্ট। সেই সর্ব্বাঙ্গে যেখানে আঁটা সম্ভব সেখানেই গয়না।

বন্ধুর সঙ্গে শেয়ারে বিড়ির পাতা আর তামাকের ছোটখাট ব্যবসা করে বৌকে এত গয়না দিয়েছে রাজীব।

তাও সে বৌ রোজ কোমর বেঁধে ঝগড়া করে! প্রত্যেকদিন বাসন্তীর গলা দু'একবার তীক্ষ্ণ উঁচু পর্দ্দায় চড়ে

যায়, কলহের ধারালো কথাগুলি এপাশ থেকেও শোনা যায় স্পষ্ট।

এত গয়না গায়ে দিয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে দেয়ালের ওপাশ থেকে ঘুরে তার সঙ্গে কথা কইতে আসে। রাখাল বেকার, সাধনার গলা শূন্য, তবু যেন তার ভাবনা নেই যে ভাব করতে গেলে সাধনা পাছে কিছু চেয়ে বসে।

এক অংশে বাস করেও আশা কিন্তু তাদের এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে আশ্চর্য্য কৌশলে। সঞ্জীবও।

মানুষটা আশা যে বাক্‌সংযমী তা নয়। রাখালের চেয়েও বড় রকমের বেকার ঘরছাড়া দেশছাড়া একটা মানুষের বৌ ভোলার মা ডিম বেচতে এলে সে এক জোড়া ডিম কিনে দশ জোড়া কথা জিজ্ঞেস করে। মানুষ এত নিরুপায় হয়েও টিঁকে থাকতে পারে ধারণা করা কঠিন, তাই বোধ হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে তার ভাল লাগে। সমানভাবে কথা কইতে হয় না, আলাপ করলে টাকা পয়সা ধার চেয়ে বসবে এ ভয়ও নেই। শুধু ডিমের দামটা দিলেই চলে। বাসি বাড়তি রুটি থাকলে একখানা একটু চিনি দিয়ে ভোলার হাতে দিলে তো কথাই নেই।

পুরানো ছেঁড়া আর ময়লা হোক, ভোলার মার পরনের কাপড়খানা তাঁতের এবং রঙীন। নতুন হলে আশাও নিশ্চয় পরতে আপত্তি করত না। এই কপড়খানাই সব সময় ভোলার মার পরনে দেখা যায়। সরকারদের মস্ত বাগানটার প্রাচীরের পাশ দিয়ে তফাতে ফাঁকা জমিতে হোগলার যে

খেলাঘরগুলি উঠেছে, তারই একটাতে তারা থাকে। বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে একটি। ওই হতভাগীই এখন নাকি সবার বড় দুর্ভাবনা—ভোলার বাপমার।

ভোলার মা কাঁদুনি গায় না। দুর্দ্দশার সে স্তর তারা পার হয়ে গেছে। বোধ হয় সেই জন্যই নানা কথা জিজ্ঞাসা করার পরেও দাম দেবার সময় আশা যখন অনায়াসে বলে, তোমার ডিমের দাম বেশী ভোলার মা!

তখন ভোলার মা রাগও করে না, নিজের দুরদৃষ্টকে শাপও দেয় না, সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় বলে, কি কথা কন? এক পয়সা বেশী না! বাজার দরে বেচি। উনি পাইকারী দরে কিনা আনেন, খুচরা দরে বেচনের লাভটুক্ থাকে।

সাধনাকে সে জিজ্ঞাসা করে, আপনে নিবেন না?

সাধনা মাথা নাড়ে।

তার গলার দিকে চেয়েই যেন ভোলার মাও মাথা হেলিয়ে তার ডিম কেনার অক্ষমতায় সায় দেয়, না কেনাকে সমর্থন করে!

গলার কাছটা শির শির করে সাধনার। বিছাহারের শূন্যতা যেন বিছার মত হাঁটছে।

রাখাল পাড়ার একটি স্কুলের ছাত্রকে সকালে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত পড়ায়। পড়িয়ে সটান চলে যায় মাইলখানেক দূরে আরেকটি কলেজের ছাত্রকে পড়াতে।

বাড়ী ফিরে নেয়ে খেয়ে বার হয়। সারাদিন ঘোরে

চাকরী এবং রোজগারের চেষ্টায়—আরও কিসের ধান্ধায় সাধনা জানে না। সন্ধ্যায় রাখাল একটি ছাত্রীকে পড়ায়—ছু'ঘণ্টা। এই টুইসনিটাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাসান্তে ক'টা টাকা পাওয়া যায় বলেই শুধু নয়, রোজ এখানে সে চা আর কিছু খাবার পায়—অন্ততঃ ছু'খানা বিস্কুট।

আশ্চর্য্য যোগাযোগ! সারাদিনের শ্রান্তি বয়ে নিয়ে গিয়ে শুধু ওই চা খাবারটুকু পেয়ে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, প্রভাকে ভাল করে পড়াতে পারে বলে প্রভারাও খুসী হয়ে তাকে রোজ চা জলখাবার দেয়।

যেদিন বাসে ফেরে রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হয়। হেঁটে ফিরলে দশটা বেজে যায়।

হেঁটে ফিরলে সাধনা বলে, ছ'টা পয়সা বাঁচালে। দেহের ক্ষয়টা হিসাব করেছ? যে রোগটা হবে ছু'শো টাকায় সারাতে পারবে?

রাখাল মুখ বাঁকায়।—রোগ হলে আর সারাবে কে? জ্যোস্নারাত, বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম। ছ'পয়সায় সিগারেট কিনলাম তিনটে।

সাধনা চুপ করে থাকে। গা যখন জ্বলে যায় তখন কথা কওয়া মানেই ঝগড়া করা। তিনটে সিগারেট কিনতে হবে, তার অজুহাত হল জ্যোস্নারাত! সিগারেট কেনার দায়ে রাখাল হেঁটে আসে নি, জ্যোস্নারাত দেখে শ্রান্তক্লান্ত অভুক্ত দেহটাকে মনের আনন্দে ছু'মাইল পথ হাঁটিয়েছে।

খেয়ে উঠে সাধনা মাই দিয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়ায়। বড়

হয়েছে, দস্যুর মত আধ-শুকনো মাই টানে ছেলেটা, বহুক্ষণ মাই দু'টি তার টনটনিয়ে থাকে। পোয়াটেক গরুর দুধ না বাড়ালে আর চলে না।

হঠাৎ তাই সখেদে বলে, হারটার ব্যবস্থা করবে না? খালি গলায় থাকতে পারব না আমি। নতুন তো চাইছি না, সে আশা ছেড়ে দিয়েছি। সোনা আছে, শুধু মজুরি দিয়ে গড়িয়ে দেবে, তাও জুটবে না কপালে? দশজনের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারি না!

রাখাল কথা বলে না। গা যখন জ্বলে যায় তখন কথা কওয়া মানেই ঝগড়া করা। তিনটে সিগারেটের একটি আধখানা টেনে নিভিয়ে রেখেছিল, সকালে খাবে। সেটা নিয়ে রাখাল ধরায়। ঘুম আসছে। ঘুমোলেই একেবারে সকাল। তবু মনে হয় সকালের এখনো অনেক দেরী।

মাঝে মাঝে অসহ্য ঠেকলেও দু'চারজনের কাছে যেচে-যেচে কৈফিয়ৎ দিয়ে আর হারটা যে তার বজায় আছে তার প্রমাণ দেখিয়েই সাধনা দিন কাটিয়ে দিত।

মুস্কিল হল হঠাৎ রেবার বিয়েটা ঠিক হয়ে যাওয়ায়।

রেবা রাখালের দিদি অনিমার বড় মেয়ে।

বিকালে রেবার বাবা প্রিয়তোষ স্ত্রী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে খবরটা দিতে এবং নিমন্ত্রণ জানাতে আসে।

আচমকা সব ঠিক হয়ে গেছে, আগে থেকে কিছুই জানতে পারে নি, ক'দিন বাদেই বিয়ে—এত অল্প সময়ের নোটিশে

মেয়ের মামা মামীকে একেবারে বিয়ের নেমন্তন্ন করতে আসার অপরাধটা প্রিয়তোষ যেন কিছুতেই হজম করতে পারছে না। বার বার সে বলে যে আগের দিন না পারলেও বিয়ের দিন সকালবেলাই তাদের যাওয়া চাই, না গেলে চলবে না। তারা তিন ভাই, ভিন্ন হলেও তিন ভায়ের ছেলেমেয়ের মধ্যে এই প্রথম বিয়ে হচ্ছে তার মেয়ের—মেয়ের মামামামী না গেলে দশজনের কাছে তারা মুখ দেখাতে পারবে না।

অনিমা বলে, তোমরা না গেলে আমারও কিন্তু মাথা কাটা যবে ভাই। শুধু রাখালকে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি যেন আবার নিয়ম রক্ষা কোর না!

অনিমা তার খালি গলার দিকে চেয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে জেনে জোর করে হেসে সাধনা বলে, কি যে বলেন, রেবার বিয়েতে আমি যাব না?

পরিতোষ বলে, আমরা বরং একটু বসি। রাখালকে নিজে বলে যাব। ও আবার যে রকম মানী লোক—

ঃ ওর ফিরতে রাত দশটা।

তাহলে অবশ্য মহা বিপদ। রাত দশটা পর্য্যন্ত বসে থাকা তো সম্ভব নয় প্রিয়তোষের পক্ষে। কাল পরশু আবার যে একবার আসবে তাও অসম্ভব। হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে, কত দিকে কত যে ঝামেলা—

সাধনা হেসে তাকে অভয় দিয়ে বলে, আমায় তো বলে গেলেন, তাতেই হবে।

তার খালি গলার দিকে বিশেষভাবে চেয়ে থেকে

প্রিয়তোষ যেন সংশয়ভরে বলে, হবে তো? না মরি বাঁচি যে করে পারি—

: না না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওর দেখা পাওয়া মুস্কিলের কথা। এমনিই ছুটোছুটির অন্ত নেই, তার ওপর আরেক কাজ জুটলো, আমায় বিয়ের হারটা ছিঁড়ে পড়ে আছে, দু'দিনের মধ্যে সারিয়ে এনে দিতে হবে। আজ করি কাল করি করে অ্যাদ্দিন করে নি, বাক্সে ফেলে রেখেছি হারটা। এবার তো আর গড়িমসি করলে চলবে না। মামী তো আর খালি গলায় হাজির হতে পারবে না প্রথম ভাগ্নীর বিয়েতে!

অনিমার মুখ থেকে ছায়া সরে যায়। প্রিয়তোষ পরম পরিতুষ্ট হয়ে নস্যি নেয়। সাধনার গলা খালি দেখে সেও সত্যি ভড়কে গিয়েছিল। এতক্ষণে সে সিঙাড়ার কোণ ভেঙ্গে মুখে দেয়, ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দেয়।

একখণ্ড ফেলনা কাগজে রাখালের নাম নিজে সই করে পাড়ার ছেলে নন্দকে দিয়ে শ্রীভারতী থেকে চা ও সিঙাড়া আনিয়ে সাধনা কোনমতে এদের কাছে মানমর্যাদা রক্ষা করেছে। দোকানটা কাছে, তিনটি বাড়ীর পরে বাসচলা বড় রাস্তার ধারে পাড়ার রাস্তার মোড়ে—পাকিস্তান থেকে গোড়ার দিকে যারা এসেছিল তাদের একজন, নাম শ্রীসীতাপতি সাহা, মোড়ে বাড়ী করেছে এবং জয়েণ্ট রেষ্টুরেণ্ট ও ময়রার দোকান খুলেছে। ঘর একটাই, একপাশে কাঁচওলা আলমারিতে রসগোল্লা পান্তুয়া প্রভৃতি

সাজানো অন্য পাশে তিনটে ডেস্ক ও বেঞ্চে বসে খাবার বা চা পানাদির ব্যবস্থা। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট ম্যামলেট ভেজিটেবল চপ পাওয়া যায়, তার বেশী কিছু নয়, মাংসাদি অপ্রাপ্য। অনেকেই সিঙাড়া দিয়ে চা খায়—সারাদিনে শ' দুই লোক। প্রথম প্রথম রাখালের সঙ্গে সাধনা সিনেমা দেখতে আসা-যাওয়ার সুবিধার জন্য এই দোকানে চা সিঙাড়া খেত।

সে অনেকদিনের কথা। টাকা ত্রিশেক বাকী পড়েছে। তবু এখনো সাধনা তার স্বামীর নাম সই করা কাগজের টুকরো পাঠালে দোকান থেকে খাদ্য আসে।

কারবার ছিল সোণার। দোকান দিয়েছে খাবারের। মেয়েরা স্লিপ পাঠালেই সীতাপতি মুখ বুজে খাবার পাঠায়।

চা খাবার খেয়ে আপনজনেরা বিদায় নেয়।

এদিকে সাধনার মনে হয় মাথায় যেন তার বজ্রাঘাত হয়েছে। এমনি না হয় একরকম চলে যাচ্ছিল, খালি গলায় সে বিয়ে বাড়ীতে যাবে কি করে? আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে সবাই জড়ো হবে সেখানে, কোন মুখে সে গিয়ে সকলের সামনে দাঁড়াবে?

অথচ না গেলেও সে হবে আরেকটা কেলেঙ্কারির ব্যাপার। ওরা নিজে এসে এত করে বলে গেছে, আগের দিন তারা যদি নিজে থেকে না যায়, পরদিন সকালে নিশ্চয় ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হবে প্রিয়তোষ নিজে কিম্বা তার ছেলে কিম্বা অন্য কেউ।

না যাবার কোন অজুহাত নেই।

ক্ষোভে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসে সাধনার। এমনভাবে ভিতরটা জ্বালা করে যে সে নিজেই বুঝতে পারে রাখালের উপর এত রাগ আজ পর্য্যন্ত কখনো তার হয় নি। রাখাল বাড়ী থাকলে আজ এখন বীভৎস কলহ হয়ে যেত। অন্ধ বিদ্বেষে অবুঝের মতই আঘাত হানত সাধনা।

রাত দশটা পর্য্যন্ত সময় পাওয়ায় এই মারাত্মক আক্রোশটা তার খানিক জুড়িয়ে আসে। ক্রমে ক্রমে খানিকটা ধাতস্ত হয়ে সে নিজেই বুঝতে পারে যে এরকম মরিয়া হয়ে শুধু ঘা দেবার জন্য আঘাত করার কোন মানে হয় না। সে রকম সাধ থাকলে এতদিনে রাখালকে সে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পারত—নিজেও সেই সঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়ে।

কিন্তু ক্ষোভ যাবার নয়। রেবার বিয়েতে যাওয়া না যাওয়ার সমস্যা মিটে যায় নি।

রাখাল বাড়ী ফেরা মাত্র তাকে খবরটা জানিয়েই তিক্তস্বরে না বলে সে পারে না, নতুন কিছু কিনে দেবে সে আশা ত্যাগ করেছি। ভাঙ্গা জিনিষটা শুধু সারিয়ে দেবে, এতদিনে তাও পারলে না, বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গেল। এখন আমি কি উপায় করি?

ঃ আগে যদি তেমন করে বলতে—

সাধনা ঝেঁঝে ওঠে, তেমন করে? মানুষ আবার কেমন করে বলে। আমি বলে চুপ করে থাকি, সব সয়ে যাই। অন্য কেউ হলে—

সাধনা অন্য কেউ হলে কি হত তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

রাখালের নেই, তবে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না। চারিদিকে গাদাগাদি ঘেঁষাঘেঁষি করে তারি মত উপায়হীনদের পাতা সংসার, প্রাণপাত করেও ভাঙন ঠেকানো যাচ্ছে না। মেজাজ আর তিক্ততার অনেক নমুনাই পাওয়া যায়। তার মধ্যে সোণার গয়না নিয়েও দু'চারটা কুৎসিৎ মর্মান্তিক ঘটনা কি আর ঘটে না।

রাখাল নিশ্বাস ফেলে বলে, জানি, অন্য কেউ হলে আমায় ঝাঁটা মারত। আমিও সুদে আসলে ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তাতে আসল ব্যাপারের এতটুকু সুরাহা হত না। তোমার সেটুকু বুদ্ধি আছে জানি তাই—

ঃ তামাসা কোরো না।

ঃ তামাসা করি নি। এরকম সস্তা তামাসা আমি করি? তুমি জানো ওটা সারানো যাবে না, নতুন করে গড়াতে হবে।

ঃ তাই তো বলছি আমি। সোণা কিনে নতুন জিনিষ গড়িয়ে দিতে বলেছি তোমায়? শুধু মজুরিটা দিয়ে—

চোখে জল এসে যায় সাধনার। চোখ মুছে বলে, এটুকু অন্তত বুঝবে তো তুমি? এতটুকু তো তাকাবে আমার দিকে? কদ্দিন হয়ে গেল খালি গলায় সসংকোচে বেড়াচ্ছি। রেবার বিয়ে এসে গেল, এবার কি উপায় হবে? শুধু মজুরি দিয়ে জিনিষটা যদি করিয়ে রাখতে, আজ এ বিপদ হত?

ঃ মজুরিও তো সোজা নয়। ওদের দোকানে বেশী মজুরি নেয়—পঞ্চাশ টাকার মত লেগে যাবে। বাজে দোকানে সস্তা হয়, কিন্তু দিতে ভরসা হয় না। আমি তাই ভাবছিলাম—

: তাই করো তুমি, ভেবেই চলো। আমি এদিকে সং সেজে বিয়ে বাড়ী যাই। অন্য হারটা নিয়েছো মনে আছে ?

মনে আছে ? সাধনা তাকে ঝাঁঝের সঙ্গে নালিশের সুরে জিজ্ঞাসা করছে তার ছোট হারটি বেচে দেবার কথা রাখালের মনে আছে কিনা—এখনো দু'মাস হয় নি! বিয়েতে দু'টি হার পেয়েছিল সাধনা। চাকরী থেকে আচমকা বেকারত্বে আছড়ে পড়াটা গোড়ার দিকে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলে সাধনাই একরকম জোর করে তাকে দিয়ে ছোট হারটি বিক্রী করিয়েছিল। রাখাল নিজেই বরং ইতস্ততঃ করেছিল কয়েকদিন। সাধনা দ্বিধা করে নি। বাড়তি ওই হারটা মানেই যখন কিছু নগদ টাকা, কেন তারা অনর্থক অচল অবস্থায় হিমসিম খাবে, পরদিন কি দিয়ে রেশন আনা বাজার করা হবে ভেবে কুল কিনারা পাবে না ? চাকরী কি আর হবে না রাখালের ? তখন আবার সে তাকে গড়িয়ে দেবে ওরকম একটি সোণার হার। কিছু লোকসান হবে—সোণার কারবারীরা সোণা কেনেও লাভ রেখে বেচেও লাভ রেখে। কিন্তু তার আর উপায় কি !

তখনকার চেয়ে আজ তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে, কষ্ট তারা করছে অনেকগুণ বেশী। সেদিন বোধ হয় তারা কল্পনাও করতে পারত না যে এরকম অনটন সয়েও জীবন থেকে প্রায় সব কিছুই ছাঁটাই করে দিয়ে আধা উপবাসেও তারা বেঁচে থাকবে। মাসে মাসে চাকরীর বাঁধা মাইনে বন্ধ হওয়ামাত্র সবদিক দিয়ে এই চরম কষ্ট যেচে বরণ

করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিছু দিনের মধ্যে আবার একটা কিছু জুটে যাবে এই আশাও সেটা সম্ভব হতে দেয় নি। সম্ভব হলে তাদের সামান্য সম্বলটুকু অত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত না।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সাধনা সেজন্য কখনো আপশোষ করে নি। যা সম্ভব ছিল না সেজন্য দুঃখ কিসের? সম্বল খুইয়ে এভাবে একটু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার বদলে চরম দুর্গতির এই স্তরে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়লে হয় তো তারাই শেষ হয়ে যেত! এখনো তবু তারা টিকে আছে, এখনো লড়াই করছে, এখনো আশা আছে সুদিনের। এটুকু বুঝবার মত সহজ বুদ্ধি সাধনার আছে।

কিন্তু আজ তার হয়েছে কি? এমন অবুঝের মত কথা বলছে কেন? সাধনা কি জানে না নতুন হার গড়াবার মজুরি দেবার ক্ষমতাও তার নেই? সারা মাস টুইসনি করে যা পায় অনটন সেটা শুষে নেয় তপ্ত তাওয়ায় জলের ফোঁটার মত?

নিছক বেঁচে থাকার জন্য যা না হলে নয় মানুষের সেই প্রয়োজনগুলিও তাদের মেটে না?

জেনেও আজ এভাবে নালিশ জানাচ্ছে, অনুযোগ দিচ্ছে। সেই হারটির কথা তুলে খোঁচা দিতে তার বাধছে না!

সব দিকে সব বিষয়ে এত হিসাব বুদ্ধি বিবেচনা আর ধৈর্য্য সাধনার, আজ গয়নার ব্যাপারে সে সম্ভব অসম্ভব ভুলে গেল?

দুঃখে চোখে জল আসতে পারে। মাঝে মাঝে কাঁদাও দুঃখেরই অঙ্গ। তাতে শুধু ক্ষতি নেই নয়, সেটা ভালই।

কাঁদলে দুঃখের চাপ কমে যায়। সাধনাকে কাঁদতে দেখলে একটা অদ্ভুত অসহ্য কষ্টে সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে যায় রাখালের কিন্তু তার সহজ বুদ্ধি গুলিয়ে যেতে দেখে কষ্ট বোধের সঙ্গে জাগে দারুণ একটা আতঙ্ক।

মনে হয়, সর্ব্বনাশ! তাহলে তো আর বাঁচা যাবে না!

সাধনা যদি ধৈর্য্য হারায়, অবুঝ হয়ে পড়ে, এ অবস্থায় বাঁচার লড়াই চালাবার সবচেয়ে বড় অবলম্বনটাই সে যদি হারায়, দু'জনেই তারা শেষ হয়ে যাবে।

ঘুমের মধ্যে খোকা স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠে। দু'বছরের শিশুর স্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠার মধ্যেও কেমন একটা অস্বাভাবিক আর্ত সুর। বিকৃত বিভ্রান্ত নিঃস্ব জীবনের প্রচণ্ড ক্ষোভ আর বিক্ষোভ এতটুকু অবুঝ শিশুর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভয়ের স্বপ্ন যেন হয়ে দাঁড়ায় আরও বেশী ভয়ঙ্কর কিছু।

ছেলেকে থাপড়ে শান্ত করতে গিয়ে সাধনা নিজেও যেন শান্ত হয়ে যায়। তার স্বাভাবিক হিসেবী সুরে বলে, আমি বলি কি, এটা বেচে দাও। ওই টাকায় কম সোণার তৈরী হার একটা কিনে ফেলি। একটু সরুই নয় হবে।

ঃ না।

ঃ কেন? দোষ কি?

ঃ তুমি ভুলে গেছ, আমি ভুলি নি। তোমার ওই হারটা বেচবার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার গায়ের এক রত্তি সোণা জীবনে কখনো বেচব না।

এতক্ষণে সাধনার মুখে মৃদু একটু হাসি দেখা দেয়। সেই সকালে তেলের অভাবে বেগুন ভাজার বদলে বেগুন পোড়া দিয়ে দু'টি খুদ মেশানো চালের ভাত খেয়ে উপার্জনের ফিকির খুঁজতে বেরিয়ে রাখাল রাত প্রায় দশটায় বাড়ী ফিরেছে, এটা কি এতক্ষণে তার খেয়াল হয়েছে? মনে পড়েছে বেকারির খাটুনিতে শ্রান্ত ক্লান্ত আধমরা মানুষটাকে একটু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করাও দরকার?

তার হাসি দেখে এই সন্দেহই জাগতে থাকে রাখালের মনে। নিজেকে সে গুটিয়ে নিতে থাকে নিজের মধ্যে। আর সহ্য হয় না। বোমার মত ফেটে গিয়ে আজ সাধনাকে চরমভাবে বুঝিয়ে দেবে যে তার কাছে এরকম ফাঁকা হাসি আর নেকামির কোন দাম নেই।

সাধনা শুধু মুখ ফুটে একটা মিষ্টি কথা বলুক! তাই যথেষ্ট মনে করবে রাখাল।

সাধনা হাসিমুখেই বলে, আমি কিছুই ভুলি নি। গা জ্বলে গিয়েছিল তোমার কথা শুনে।

বোমার মত ফাটার বদলে রাখাল ঝিমিয়ে যায়,—তাই নাকি! কিছু তো বল নি!

ঃ গা জ্বলে গিয়েছিল বলেই বলি নি। বললে ঝগড়া হত। সেদিন বলি নি, আজ বলছি। হারটা বুঝি বেচেছিলে তুমি? গয়ণা আমার, তুমি বেচবে কি রকম? আমার গয়ণারও মালিক নাকি তুমি যে ওরকম প্রতিজ্ঞা কর? সেবারও আমার গয়ণা আমি বেচেছিলাম, এবারও আমিই

বেচব। সেবারের মত এবারও আমার হয়ে তুমি দোকানে যাবে এইমাত্র।

ঃ তাই নাকি!

ঃ তা নয়? তুমি পরামর্শ দিতে পার, বারণ করতে পার, ধমক দিতে পার—একবার কেন, একশোবার! তুমি জোর করে বললে আমি কি সত্যি সে হারটা বেচতাম, না এটা বেচব? সে হল আলাদা কথা। তুমি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা বললে কি না। ও রকম প্রতিজ্ঞা তুমি করতেই পার না।

রাখাল আলনায় ঝুলানো জামার পকেট থেকে আধখানা সিগারেট বার করে এনে ধরায়। এই আধখানা সিগারেট তার রাত্রে খাওয়ার পর টানার জন্য বরাদ্দ থাকে। তিক্তস্বরে বলে, প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি। তোমার গয়ণা তুমি বেচবে কি না বেচবে সেটা ভিন্ন কথা। আমার দরকারে মরে গেলেও আমি তোমার গয়ণা নিয়ে বেচব না, এ প্রতিজ্ঞা আমি করতে পারি।

ঃ না, তাও তুমি পার না। দরকার কি তোমার একার? ফূর্তি করে উড়িয়ে দেবার জন্য মরে গেলেও বৌয়ের গয়ণা নেবে না, তুমি কি এই প্রতিজ্ঞা করার কথা বলছ? সংসার চালাবার দরকার তোমার যেমন আমারও তেমনি।

সাধনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কার কিসে কতটা দরকার বোঝাবার জন্যই বোধ হয়। এতক্ষণের তর্কবিতর্ক রাগ আর ঝাঁঝালো অভিমান কোথায় উড়ে যায় কে জানে,

আতঙ্কে রাখালের বুক ধড়ফড় করে। কোথায় গেল সাধনা? কিছু করে বসবে না তো?

এক পলকে সে বুঝে গেছে, এ সমস্তই ফাঁকি। দশজনের মত বৌ ছেলে নিয়ে সংসার করতে চায় অথচ সংসার করবার জন্য দরকারী পয়সা উপার্জনের ক্ষমতা তার নেই, নানা প্যাঁচালো কথায় সে তাই সাধনাকে মজিয়ে রাখতে চায়, নিজেকে খাড়া রাখতে চায় সাধনার কাছে।

স্বামী রোজগার করবে আর বৌ ঘর সামলাবে এই চিরন্তন রীতির সংসারটা আজো তার কাম্য হয়ে আছে— অচল হয়ে এলেও যে ভাবে হোক চালিয়ে যেতে হবে। ভিত্তিটা সে বজায় রাখতে চায় আগের দিনের—অথচ আসলেই তার ফাঁকি। সংসার আছে, রোজগার নেই। সংসারের মায়া আছে, রোজগারের সামর্থ্য নেই।

সাধনা ফিরে এসে বলে, তবে তাই ঠিক রইল। সকালে আগে এটা করবে, তারপর অন্য কাজ। খাবে এসো।

ঃ আমি তো খাব না।

চোখ বড় বড় করে সাধনা বলে, খাবে না মানে? ছেলেমানুষি কেরো না!

ছেলেমানুষের মত সে ভাতের উপর রাগ করতে পারে ভেবে সাধনা যে ভঙ্গি করে তাতে হঠাৎ তাকে ভারি সুন্দর মনে হয় রাখালের। অনেকদিন পরে মনে হয়। এবং

সেজন্য এটাও তার খেয়াল হয় যে সাধনার রূপ-লাবণ্যে আজকাল বেশ ভাঁটা পড়েছে। তাকে আদর করাও আজকাল একরকম হয়ে ওঠে না। সময়ের অভাবে নয়। শক্তি আর ইচ্ছার অভাবে।

: খাব না মানে খেয়ে এসেছি। প্রভাদের বাড়ী খাইয়ে দিল।

সাধনা বলে, এতক্ষণ বল নি?

: বলবার সময় দিলে কই? ঘরে পা দেওয়ামাত্র গয়ণার কথা আরম্ভ করলে।

: আমি তবে খেয়ে আসি।

ঘরে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে রাখালের একটা গুরুতর কথা মনে পড়ে যায়। সাধনাকে কথাটা বলতে তার এক মুহূর্ত দেরী সয় না, তাড়াতাড়ি উঠে যায় রোয়াকের কোণে সাধনা যেখানে খেতে বসেছে।

খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সাধনার।

: তুমি তো শুধু নিজের গলার ব্যবস্থা ঠিক করলে। একটা কথা ভেবেছ?

: কি কথা?

: রেবাকে কিছু দিতে হবে না?

সাধনার হাত অবশ হয়ে ভাতের গ্রাস পড়ে যায়। সুখের বিষয় থালাতেই পড়ে। ভাতের বড়ই টানাটানি আজকাল।

রাখাল চেয়ে ত্যাখে, এলুমিনিয়মের ভাতের হাঁড়িটা শূন্য,

সাধনা চেঁছেপুছে সব ভাত বেড়ে নিয়েছে। ডালতরকারীর পাত্র দুটিও চাঁছামোছা।

অর্থাৎ সে আজ বাইরে থেকে খেয়ে না এলে যে ভাত আর ডালতরকারী দু'জনে ভাগ করে খেত, সাধনা একাই তা খেয়েছে। অনেকদিন পরে আজ তাদের পেট ভরেছে দুজনেরই। তার ভরেছে বড়লোকের বাড়ীর মাংসভাতে, সাধনার ভরেছে স্বামীর ভাগের অন্নটুকু বাড়তি পেয়ে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে হেঁসেল তুলে ঘরে গিয়ে সাধনা বাক্স খোলে। কিনে কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, নিজের বিয়েতে পাওয়া কিছু দিয়ে যদি মান রক্ষা করা যায়।

গম্ভীর মুখে হুকুমের সুরে রাখাল বলে, সোণার কিছু দিতে পারবে না।

সাধনা মুখ ফিরিয়ে তাকায়।—কাণপাশাটা নতুন আছে। ওটাই দেব।

: তোমার কাণপাশা যদি তুমি রেবাকে দাও—

: কি করবে? মারবে? একটা কিনে দাও, আমারটা দেব না। বার আনি সোণাতেই কাণপাশা হবে।

: আমরা রেবার বিয়েতে যাব না।

: তুমি না যেতে পার, আমি যাব।

আজ রাত্রে তারা অনেক দিন পরে পেট ভরে খেয়েছে।

আজ রাত্রেই অনেকদিন পরে তাদের সোজাসুজি পষ্টাপষ্টি সামনা সামনি সংঘাত বাধল।

একেবারে চুপ হয়ে গেল দুজনে। পেটভরা অন্ন আর বুক ভরা জ্বালা কি মানুষকে বোবা করে দেয়?

২

এ কিরকম কলহ? এতখানি ভদ্র ও মার্জিত? স্বামী নিষেধ করে দিল, আমার ভাগ্নীর বিয়েতে তোমার বিয়ের গয়ণা দেওয়া চলবে না। স্ত্রী জানাল, এ হুকুম সে মানবে না। স্বামী বাতিল করে দিল তাদের বিয়েতে যাওয়া। স্ত্রী জানাল, আরেকজন যাক বা না যাক, সে যাবেই।

সেখানেই শেষ।

একটা কটু কথা নয়, রাগারাগি চেঁচামেচি নয়, গলায় দড়ি দিয়ে বা যেদিকে দু'চোখ যায় চলে গিয়ে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিজ্ঞা নয়, এক পক্ষের কপাল চাপড়ানো আর অন্যপক্ষের কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া নয়—একরকম কিছুই নয়!

একটু নীরস রুক্ষ রাগতভাবে পরস্পরের অ-বনিবনাটা যেন শুধু পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হল।

তবু দুজনেরি মনে হল বিয়ের পর আজ তারা প্রথম সত্যিকারের কলহ করেছে, একেবারে চরম কলহ, লঘুক্রিয়াতে যা শেষ হবে না।

সংযত ভদ্রভাবেই পরস্পরের বুকে যেন তারা বিষমাখা শেল বিঁধিয়ে দিয়েছে।

যার ফলে হতভম্ব হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকতে হল তাদের।

তারপরেও অবশ্য সাধারণ দরকারী কথা হল সাধারণ ভাবেই। খানিকটা প্রাণহীন উদাসীনতার সঙ্গে। এক বিছানায় পাশা পাশি শুয়ে রাত কাটল দু'জনের। প্রাণের জ্বালায় কিছুতে ঘুম না আসায় দু'জনেরি মনে হল ভালবাসার খেলায় হয় তো বা এই নিষ্ঠুর ব্যবধান খানিকটা ঘুচিয়ে দেওয়া যাবে। অন্ততঃ সামঞ্জস্য ঘটানো যাবে খানিকটা।

কিন্তু চাইলেই যেমন চাকরী মেলে না, শুধু সাধ হলেই তেমনি বিবাদও ঘুচে যায় না মানুষের। সাধের সাধ্য কি বাস্তবকে বাতিল করে দেয়!

সকালে পাড়ার ছেলেটিকে পড়াতে গিয়ে রাখাল ভাবে, তার ছাত্রটির মা বাবার মত প্রাণ খুলে কোমর বেঁধে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তারা যদি ঝগড়া করতে পারত, ওদের মতই আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সব মিটমাট করে নিতে পারত নিজেদের মধ্যে,—যেন কিছুই ঘটেনি!

সকাল বেলা কলতলায় জলের জন্য দাঁড়িয়ে বাড়ীর পাশের অংশের নতুন ভাড়াটে রাজীবের স্ত্রী বাসন্তীর চড়া ঝাঁঝালো সরু গলার আওয়াজ শুনতে শুনতে সাধনা ভাবে, ছোট বড় সব ব্যাপারে সেও যদি এরকম যখন তখন মেজাজ দেখাত আর রাখাল সেটা সয়ে যেত!

রাখালের সকালের এই ছাত্রটি সতীশ মল্লিক চৌধুরীর ছেলে বিশু। দেবেন ঘোষের দোতালা বাড়ীটা কিনে

নিয়ে সতীশ সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এখানে বসবাস করতে এসেছে। বিশু সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে, বুদ্ধি একটু ভোঁতা। কিন্তু মুখস্ত করে পরীক্ষায় বেশ পাশ করে এসেছে বরাবর।

গোড়ায় প্রতিদিন এক ঘণ্টা তাকে পড়া বোঝাবার চেষ্টায় রাখাল হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। মাস দু'য়েকের মধ্যে নিজের বোকামি বুঝতে পেরে এখন সে বিশুকে যতটুকু তার সহজবোধ্য ততটুকু বুঝিয়ে বাকী পড়া মুখস্ত করতে দেয়।

মাসকাবারে বেতনের টাকা নেবার সময় মনটা একটু খচ্‌খচ্‌ করে। কিন্তু উপায় কি। একটি ছাত্রের সঙ্গে লড়াই করে সে তো সংসারের একটা ব্যবস্থা পাল্টে দিতে পারবে না একা।

সতীশ ছেলেমেয়েকে দামী পেষ্ট আর দাঁতের বুরুশ কিনে দিয়েছে, নিজের কিন্তু তার দাঁতন ছাড়া চলে না। ছত্রিশ হাজার টাকায় কেনা তার এই বাড়ীটাতে যেটা ছিল পৃথক কিন্তু পাকা বাথরুম, সেটাকে সে পরিণত করেছে গোয়ালঘরে। তিনটি গরুর মধ্যে একটি গাভীন, অন্য দু'টি দুধ দেয়।

একটির বাছুর মরে গেছে। দেশে সতীশেরা বাছুর-মরা গরুর দুধ খেত না। এখানে গয়লা রামেশ্বরের পরামর্শে মরা বাছুরের চামড়া খড়ে জড়িয়ে বাঁশের বাতার ঠ্যাং লাগিয়ে সামনে রেখে গরুটির দুধ দোয়ানোর ব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছে।

তবে এ গরুর দুধটা ছেলেমেয়েরাই খায়। বাছুরওয়ালা গরুটির দুধ ভিন্ন দোয়া হয় সতীশের জন্য, জ্বালও দেওয়া হয় ভিন্ন কড়াই-এ। নিয়ম-ভাঙ্গা অনিয়ম তার চেয়ে ছেলে-মেয়েদের পক্ষে মেনে নেওয়া অনেক সহজ।

দোতালায় কোণার ঘরে পড়ানোর ব্যবস্থা। মেঝেতে শীতল পাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। বৈঠকখানা আছে কিন্তু সেখানে সতীশ বসবে নিজে। অন্তঃপুরে নিরিবিলিতেই ছেলেপিলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

ছেলের মাষ্টারও খানিকটা গুরুজাতীয় মানুষ। পরের মত তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখতে মন খুঁতখুঁত করে। শিক্ষাদানের মত পুণ্য কাজটা তিনি বাড়ীর মধ্যে ঠাকুর ঘরে করবেন এটাই সঙ্গত।

ভক্তিভাজন পুণ্যকর্মা মানুষ বলেই বাড়ীর লোকের সাধারণ চা খাবারের ভাগ রাখালকে দেওয়া হয় না। বিশু খাবার খায়, একবাটি দুধ খায়, রাখাল জানালা দিয়ে খানিক তফাতে ফাঁকা মাটির মধ্যে ছেলেখেলার ঘরের মত ছোট ছোট কুঁড়ে দিয়ে গড়া উদ্বাস্তুদের কলোনিটার দিকে চেয়ে থাকে। ভোলার মা ওই কলোনি থেকে ডিম বেচতে বেরোয় চারিদিকের পাড়ায়।

দেখা যায়, রাস্তার কলটাতে কলোনির দশ বারটি মেয়ে বৌ ভিড় করেছে।

পূজা পার্ব্বণের প্রসাদ মাঝে মাঝে রাখাল পায়। বিশুর মা অথবা তার বিধবা বোন নির্ম্মলা থালায় সাজিয়ে ফলমূল

নাড়ু মোয়া তাক্ত সন্দেশ ইত্যাদিতে প্রায় পনের বিশ রকমের প্রসাদ এনে দেয়।

বলে, প্রসাদ খান।

বিশুর মার রঙ একটু কালো। দেহটি যেন সযত্নে কুঁদে গড়া। কে বলবে তার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, বড় মেয়ের বয়স সতর আঠার এবং সম্প্রতি মেয়েটির একটি ছেলে হওয়ায় সে দিদিমা হয়েছে। পয়সারও অভাব নেই—অন্ততঃ এতকাল মোটেই ছিল না—খাটবার লোকেরও অভাব নেই, তবু প্রাণের উল্লাসে বিশুর মা সংসারের পিছনে কি খাটুনি খাটে আর কত নিয়মনীতি মেনে চলে দেখে রাখাল বুঝতে পেরেছে তার দেহের ঠাট কিসে এরকম বজায় আছে।

শুধু ভাল খাওয়া ভাল থাকার জন্য নয়। দেহ মনের সমস্ত অকারণ ক্ষয় ক্ষতি নির্য্যাতন বর্জন করার জন্য। সতীশের সঙ্গে যখন তখন ঝগড়া করে কিন্তু মানুষটা সে সোজা সহজ সংযমী—সংস্কার কুসংস্কার গ্রাম্যতা সভ্যতা নিয়ম নীতি সমেত নিজের জীবনে মসগুল। স্বামীর সঙ্গে কলহ তার কাছে সংসারধর্ম ঠিকমত পালন করারই একটা আনুসঙ্গিক ব্যাপার, তার বেশী কিছু নয়।

ব্রত পূজা পার্ব্বণের উপলক্ষে বিশুর মার উপবাস লেগেই আছে। আজ বা এ মাসে এটা খেতে নেই, কাল বা ওমাসে ওটা খেতে হয়, এসব নিয়ম পালনের ব্যাপারেও সে খুব কড়া।

প্রথম প্রথম অবজ্ঞার হাসি ফুটত রাখালের মুখে।

ভাবত, ময়রার অরুচি জন্মে মিষ্টান্নে। সব রকমের পুষ্টিকর সুখাদ্য যার এত বেশী জোটে যে শুধু চেখে দেখতে গেলে পেট খারাপ হতে বাধ্য, সে ব্রত পার্ব্বণের অজুহাতে উপোস করবে না তো করবে কে ?

ক্রমে ক্রমে সে বুঝেছে অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কথাটা। বুঝেছে সাধনাকে পেট ভরে খেতে না পেয়ে চোখের সামনে রোগা হয়ে যেতে দেখে। পুষ্টিকর খাদ্য সে পায় না, আগেও পেত না। সে অতীতকে আজকের তুলনায় তার সুদিন মনে করে, তখনও তার খাদ্য ছিল সাধারণ ডাল ভাত। তবে পেটটা তখন দু'বেলা ভরত, আজ তাও ভরে না।

বিশুর মা চিরদিন দুধ ঘি মাছ খেয়েছে, আজও খায়। কিন্তু উপোস আর খাদ্যের এত বাছবিচার তার ভাল জিনিষে অরুচির জন্য নয়। শরীর রক্ষার জন্যই এসব তাকে পালন করতে হয়। নিয়মিত শাঁসালো খাবার খাওয়ার এটাই হল নিয়ম। বারমাস মাছ দুধ ক্ষীর সর ঠিক এভাবেই খেতে হয়। মাঝে মাঝে উপোস দিয়ে।

কিন্তু এদেশে বিশুর মার মত জমিদার গিন্নি হবার ভাগ্য আর কজনে করেছে। বার মাস যারা পেট ভরে ডাল ভাতও পায় না তারাও তো এসব ব্রত পূজার নিয়ম মানে, উপোস করে। এমনিই যাদের কম বেশী নিত্য উপবাস, তাদের বেলাও বাড়তি উপোসের প্রথা কেন ?

বাইরে ঠিকা ঝি মায়ার গলা শোনা যায়, ওবেলা

এসুবো নি মা, আগে থেকে বলে রাখলুম। ছু'দিন উপোস আছি।

বিশুর মা বলে, উপাস খালি তুমি করছ নাকি ? আমরা উপাস করি না ? উপাস কইরা কাম করন যায় না ?

ঃ তা জানিনে মা। ও বেলা পূজা দিতে যাব।

ঃ তাই কও, পূজা দিতে যাইবা।

সেই পুরাণো দিন থেকে এসব উপোসের বিধি চলে আসছে, সবাই যখন পেট ভরে খেতে পেত ? ওরকম দিন কি কখনো ছিল এদেশে ? কেউ গরীব ছিল না, সবাই মিঠাইমণ্ডা যত খুসী খেত ? রাখাল বিশ্বাস করে না। দরকার মত অন্ন পেত মানুষ, সাধারণ শাকান্ন। মাঝে মাঝে উপোস দিয়ে খেতে হয় এমনি সব ছাঁকা ছাঁকা খাদ্য সকলের জুটত বার মাস, এ অবাস্তব কল্পনা।

বাড়ীর ঝি মায়ার বয়স সাধনার চেয়ে বেশী হবে না। বারান্দা মুছতে মুছতে সে দরজার সামনে আসে। ঠাকুর ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত তার মুছবার সীমা, চৌকাট পার হওয়া বারণ।

ঃ গরীবের সাধ করে উপোস দিয়ে লাভ কি বাছা ?

হঠাৎ তার প্রশ্ন শুনে ঘর-মোছা ন্যাতা উঁচু করে ধরে মায়া একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কিন্তু আচমকা বলেই কথাটা সে হাল্কা ভাবে নেয় না। এ মানুষটা তার সঙ্গে তামাসাই বা করতে যাবে কেন ?

ঃ গরীব বলে ধম্মোকম্মো রইবে নি ?

: তা রইবে। এমনি তো খেতে জোটে না, ফের উপোস দিয়ে কি হয়?

: নিয়ম আছে, মানতে হয়!

তাই বোধ হয় হবে। রোজ পেট ভরা শুধু শাকান্ন জুটলেও মাঝে মাঝে উপোস দিলে উপকার হয়। একদিন তাই সকলের জন্যই এ নিয়ম হয়েছিল, রাজরাণী বা চাকরাণীর মধ্যে তফাৎ করা দরকার হয় নি। আজ মায়াদের পেট ভরে না কিন্তু নিয়মটা রয়ে গেছে।

নীচে নেমে বিশুর মাকে দেখে রাখাল আজ অবাক হয়ে যায়। বেনারসী পরেছে দেখে নয়, গায়ে তার গয়ণার বহর দেখে। কোন অঙ্গই বুঝি বাদ যায় নি, মোটা মোটা দামী দামী গয়ণা চাপিয়েছে নানা প্যাটার্ণের। এত সোণাও আঁটে একটা মানুষের গায়ে!

অথচ, আশ্চর্য্য এই, এতদিন তার গায়ে গয়ণার একান্ত অভাবটাই খাপছাড়া মনে হত রাখালের। হাতে ক'গাছা চুরি আর গলায় সাধারণ একটি হার ছাড়া কোথাও সোণা তার চোখে পড়ে নি আজ পর্য্যন্ত!

সতীশের বেশ দেখে বোঝা যায় কর্ত্তা গিন্নি কোথাও যাবে।

বিশুর মা বলে, কুটুমবাড়ী যামু, গাড়ীর লেইগা খাড়াইয়া আছি। এমন মানুষ আর সংসারে পাইবা না। সময় মত খেয়াল কইরা গাড়ীটা আনতে দিব—

সতীশ বলে, দেই নাই? কখন লোক পাঠাইছি। হারামজাদা রসিকটা কোন কামের না।

ঃ যেমন মানুষ তুমি, তোমার লোকও জোটে তেমন।

রাস্তায় নামতে নামতে রাখাল ভাবে, কুটুম বাড়ী থেকে ফিরে বিশুর মা কি গয়নাগুলি খুলে রাখবে? এ রকম কোন বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া সে গয়না গায়ে চাপায় না কেন?

এত গয়না আছে অথচ দু'একখানার বেশী গায়ে চাপায় না, কে জানে এর মধ্যে কি রহস্য আছে!

ছেলের জন্য সারাদিনে মোটে এক পোয়া দুধ। মাই ছাড়ানো উচিত ছিল ক'মাস আগেই কিন্তু ওই জন্যই সম্ভব হয় নি। এক পোয়া দুধে ওর কি হবে? কিন্তু এদিকে বুকের দুধও তার শুকিয়ে এসেছে। কদিন পরে দুধের বরাদ্দ আরেকটু না বাড়ালে উপায় থাকবে না।

উনান ধরিয়ে সাধনা জল মিশিয়ে দুধটুকু জ্বাল দিচ্ছে, এত সকালে বাসন্তী এল।

ওদিকে বিশুর মার গায়ে রাখাল যেমন দেখেছে তার সঙ্গে তুলনা না হলেও বাসন্তীর গায়েও গয়ণা কম নয়। সোণাদানা যা কিছু আছে দিনরাত সে গায়ে গায়েই রাখে। সকালবেলা এখন ঘরে পরার সাধারণ শাড়ী সেমিজের সঙ্গে গায়ে এত গয়ণা শুধু বেখাপ্পা ঠেকে না, অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে রাত্রে সে কি এতগুলি গয়ণা গায়েই শোয়? অথবা রাত্রে কিছু খুলে রেখে সকালে ঘুম ভেঙ্গে প্রাতঃকৃত্য সারবার মত আগে গয়ণাগুলি গায়ে চাপায়?

সাধনার চেয়ে কয়েক বছর বয়সে বড়। কিন্তু মুখখানা তার চেয়েও কচি দেখায়। তাকে দেখে কল্পনা করাও কঠিন যে মানুষটা সে অতিমাত্রায় ঝগড়াটে আর ঝগড়ার সময় তার গলা দিয়ে অমন বাঁশীর মত সরু আওয়াজ বার হয়!

সাধনা বলে, ঘরে চলুন, এখানে আমারি বসার যায়গা হয় না।

বাসন্তী বলে, না না, বসব না। আপনি কাজ করেন। এখন কথা বলার সময় আপনারও নেই আমারও নেই। আমিও ভাত চাপিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে সে মেঝেতেই বসে পড়ে।

ঃ উনি বাজারে গেলেন। আমি ভাবলাম, এই ফাঁকে আপনাকে একটা দরকারী কথা বলে যাই।

তার কাছে দরকারী কথা? সাধনা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে, বলুন না?

ঃ বলি। আগে বলুন রাগ করবেন না?

ঃ রাগ করব? কি কথা বলবেন যে রাগ করব?

ঃ আগে কথা দিন রাগ করবেন না। নইলে বলব না।

তার আতুরেপনায় সাধনার হাসি পায়। একটু আহ্লাদী না হলে সব সময় এত গয়ণা গায়ে চাপিয়ে রাখার সাধ কারো হয়! সে মৃদু হেসে বলে, বেশ তো কথা দিলাম।

বাসন্তী ইতস্তত করে, অকারণে একবার একটু হাসে, তারপর বলে, আপনার ভাঙ্গা হারটা আমায় বেচে দিন। রাগ করবেন না বলেছেন কিন্তু।

রাগ করবে না কথা দিলেও মুখ অন্ধকার হয়ে আসে সাধনার। সে তিক্তস্বরে বলে, আপনি কি করে শুনলেন আমাদের কথা? আপনাদের ঘর থেকে বুঝি শোনা যায়?

বাসন্তী যেন আকাশ থেকে পড়ে।

ঃ আপনাদের কথা? কই আপনাদের কথা তো শোনা যায় না কিছু?

ঃ তবে কি করে জানলেন আমি হার বেচব?

ঃ আপনিই তো আমাকে পরশুদিন বললেন ভাই। বেচবার কথা বলেন নি, বলছেন ওটা আর সারানো যাবে না, নতুন গড়িয়ে নেবেন।

সাধনা লজ্জা পায়। তাই বটে, তার বাক্সে তুলে রাখা ভাঙ্গা একটি হারের কথা কাউকে বলতে সে কি বাদ রেখেছে। তার একটা ভাঙ্গা হার আছে, সেটার বদলে সে নতুন হার গড়িয়ে নেবে এ খবর যে সারা সহরে রটে যায় নি তাই আশ্চর্য্য।

ঃ কিছু মনে করবেন না। আমারি ভুল হয়েছে।

ঃ মনে তো করবেন আপনি। আমি কোন স্পর্দ্ধায় আপনার ভাঙা হার কিনতে চাইব? তাই জন্যে তো কথা আদায় করেছি, রাগ করবেন না। কাল বুঝি এই নিয়ে কথা হয়েছে কর্তার সঙ্গে? আমি সব শুনে ফেলেছি ভাবছিলেন বুঝি?

বাসন্তী সজোরে মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, একটা

কথাও শুনিনি। আপনাদের ঘরের কথা শুনতে পেলেও শুনতে যাব কেন ভাই?

পরক্ষণে মুখের ভাব ও গলার স্বর পালটে বলে, ওমা, ওদিকে ভাত চড়িয়ে এসেছি। আমি বরং খোলাখুলি সব বলি আপনাকে। আপনার কাছে লুকোব না। শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমি হারটা কিনতে চাইলে আপনাদের কোন অপমান নেই। আপনাদের কোন ক্ষতি নেই, এদিকে আমার যদি একটা উপকার হয়—

সাধনা বলে, তাই ভাবছি। ভাঙা হার কিনবেন কেন?

ঃ সে কথাই বলছি। কথাটা কিন্তু ভাই কাউকে বলবেন না। কাউকে বলবেন না মানে অবিশ্যি আপনার উনিকে বাদ দিয়ে। ওনাকে তো নিশ্চয় বলবেন!

বাসন্তী একগাল হাসে। হাসিটা যতখানি সম্ভব বজায় রেখে বলে, ব্যাপারটা কি জানেন, লুকিয়ে কিছু নগদ টাকা জমিয়েছি। টাকা কি লুকিয়ে রাখা যায়? তাই ভাবলাম, আপনার ভাঙ্গা হারটা কিনে রাখি, টাকার বদলে সোণা থাক। লুকোচুরিরও দরকার থাকবে না। কে জানছে বাক্সের ভাঙ্গা হারটা আমার নয়? মেয়েছেলেদের কোন গয়ণা আস্ত আছে কোন গয়ণা ভেঙ্গে গেছে অত খবর কি ব্যাটাছেলে রাখে?

সাধনা মনে মনে ভাবে, তা এক কাঁড়ি গয়ণা থাকলে আর কি করে খবর রাখবে।

বাসন্তী এবার মুখখানা গম্ভীর করে। বলে, আপনাদের

ভাববার কিছু নেই। দোকানে ওজন করিয়ে দর কষে আনবেন, যা দাম হয় আমি তাই দেব। দোকানে বিক্রী করতেন, তার বদলে আমায় করছেন।

সাধনা একটু ভেবে বলে, আপনি নতুন কিনবেন না কেন?

বাসন্তী মুচকে হাসে। এবারও মুচকি হাসিটা বজায় রেখেই বলে, আসল কথা, টের পেয়ে যাবে। নতুন সোণার গয়ণা কি লুকানো যায়? তা ছাড়া, আর গয়ণা চাই না ভাই, ঢের আছে। টাকার বদলে সোণা রাখব, নিজের জমানো টাকা কেন নষ্ট করব নতুন গড়াবার মজুরি দিয়ে?

সে উঠে দাঁড়ায় নাঃ, ভাত আমার পোড়া লাগবে ঠিক! এখন বলবেন, না আরেকজনের সাথে পরামর্শ করে—?

সাধনা বলে, কিনতে চাইলে আপনাকে দেব না কেন?

বাসন্তী যেন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যায়।

খানিক পরেই রাখাল ফিরে আসে।

বিশুকে পড়িয়ে সে সাধারণতঃ বাড়ী আসে না, সোজা চলে যায় দু'নম্বর ছাত্রটিকে পড়াতে। এ ছাত্রটির বাড়ী বেশ খানিকটা দূরে, হেঁটে যেতে মিনিট কুড়ি লাগে। আটটা থেকে ন'টা পর্য্যন্ত তাকে পড়াবার কথা। সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত বিশুকে পড়িয়ে কাছাকাছি হলেও নিজের ঘরে উঁকি দিয়ে যাবার সময় থাকে না।

সাধনা ভাবে, রাখাল কথা তুলবে। নইলে বাড়ী এল কেন ?

রাখাল ভাবে, সাধনা নিশ্চয় বুঝেছে এখন তার ঘরে আসার মানে। সেই নিশ্চয় আগে কথা তুলবে।

ডাল চাপিয়ে সাধনা বলে, রেশন এলে ভাত হবে। কাল বলে রেখেছি।

রাখাল বলে, কার্ড আর থলি দাও। বিমলকে পড়াতে যাবার পথে কার্ড জমা দিয়ে যাব। এখন বড় ভিড়। আসবার সময়—

ঃ বরাবর তাই তো কর। এদিকে আমার উনুন যাবে কামাই। একদিন আগে রেশনটা এনে রাখলে দোষ হয় ? কয়লা কিনতেও তো পয়সা লাগে ?

সাধনার গলা চড়েছে। পার্টিশনের ওপাশে বাসন্তী যাতে অনায়াসে শুনতে পারে, এতখানি চড়েছে !

জীবনে আজ পর্য্যন্ত সে এতখানি গলা চড়িয়ে সাধারণ কথা কেন কোন কথাই বলে নি।

ঃ সত্যবাবু আজ টাকা না দিলে রেশন আসবে না।

তার ছ'নম্বর ছাত্র বিমলের বাবা সত্যবাবু সরকারী উকিল। তার কাছে মাসকাবার বলে কিছু নেই। অবশ্য শুধু এটা ঘর থেকে টাকা বার করে পাওনা মেটাবার বেলায়। পাওনা সে কারো বাকী রাখে না, যাকে যা দেবার শেষ পর্য্যন্ত দিয়ে দেয়, কিন্তু সময়মত দেয় না। টাকা সম্পর্কে তার মূল-নীতি হল, নগদ যা আসবে তা যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব ঘরে আনা, যা দিতে হবে তা যতদিন সম্ভব দেরী করে ঘর থেকে বার করা। মাসে দশ বার তারিখের আগে রাখাল তার কাছে ছেলে পড়ানোর মজুরি আদায় করতে পারে না।

সাধনা তা জানে। সত্যবাবুর কাছে গত মাসের বেতন আদায় করে তবে আজ রাখাল রেশন আনবে এটাও তার আগে থেকেই জানা। কিন্তু জানা হল নিছক জ্ঞান। ছাঁকা জ্ঞান দিয়ে মানুষ কারবার করেছে, কেউ কোনদিন শুধু জ্ঞান ধুয়ে জল খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা রাখতে পারে নি।

সাধনা বলে, রেশন না এলে একলা আমি উপোস দেব না।

: আজ টাকা না দিলে কাজ ছেড়ে দেব।

: তা ছাড়বে বৈকি, নইলে চলবে কেন? একটা কাজ ছেড়েছ গোয়াতুর্মি করে, অভিমানে আরেকটা কাজ ছেড়ে একেবারে উপোস তো দিতেই হবে।

রাখাল একটু থ' বনে যায়। সাধনার তাহলে মুখ খুলছে? এবার তারা কলহবিদ্যায় ক্রমে ক্রমে ধাতস্থ হবে নাকি?

: আটটা বাজে, আমি যাই।

বলেই রাখাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। যেন পালিয়ে যায়। না গিয়ে তার উপায় নেই। সত্যবাবুর ছেলেকে পড়াতে যাবার সময় নির্দিষ্ট আছে। আজ সত্যবাবুর কাছে তার ছেলেকে পড়ানোর বাকী মজুরিটা আদায় করতেই হবে,

নইলে রেশন আসবে না। সময় মত কাজে হওয়া দরকার। সাধনা এসব বোঝে।

তবু সাধনার বুক জ্বলে যায়। কিছুতে তুলল না হারের কথাটা! ব্যবস্থা করার জন্য সেই আবার নিজে থেকে তোষামোদ করুক, এই ইচ্ছা রাখালের?

এদিকে রাখালের প্রাণটাও জ্বালা করে। রেশন কার্ড আর থলিটাও এগিয়ে দেবে না সাধনা, তাকেই খুঁজে পেতে নিয়ে যেতে হবে! তা, তার মত অপদার্থ মানুষ আর কি ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে?

জ্বালার উপর জ্বালা! একজনের মর্ম্মান্তিক অভিমানের, আরেকজনের সর্ব্বনাশা আত্মগ্লানির।

৩

রাখাল বেরিয়ে যেতেই পাশের ঘরের আশা এসে বলে, চিনিটা দেবে ভাই?

: রেশন আনতে গেছে। এলেই দেব।

আশা মুখ ভার করে ফিরে যায়।

আধ কাপ চিনি ধার করেছিল, তারই জন্য তাগিদ। পাশের ঘরে থাকে তবু কত অনায়াসে সঞ্জীব আর আশা তাদের এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলে ভাবতে গেলে সাধনার মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ হয়। মাঝে মাঝে, সব সময় নয়।

আজ ইচ্ছা হচ্ছিল একটা চাপড় মারে আশার গালে। রেশন কার্ড আর থলি নিয়ে রাখালকে বেরোতে দেখেই যে আশা চিনিটুকু ফেরত চাইতে এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিনি সাধনা দিতে পারবে না জানে, সেজন্য বিরক্ত হবার সুযোগ জুটবে। টাটকা তাগিদটা ভুলতেও পারবে না সাধনা, খানিক বাদে রেশন এলে চিনিটাও ফেরত দেবে।

তারই আগেকার রান্না ঘরটি দখল করে রাখে, দিনে শতবার মুখোমুখি হতে হয় উঠানে বারান্দায় কলতলায়, আশা যেন তাকে দেখতেই পায় না। কত লোকের সঙ্গে যেচে কত কথা বলে সঞ্জীব, রাখালের সঙ্গে মুখোমুখি হলেও যেন বোবা বনে থাকে। এক বাড়ীতে পাশাপাশি থেকেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই ওরা একান্ত নিস্পৃহ, উদাসীন।

সাধনা জিজ্ঞাসা করে, কটা বাজল দিদি ?

জবাব আসে ঘড়ি ঠিক নেই।

ওই বেঠিক ঘড়ি ধরেই ঠিক সময়ে সঞ্জীব কিন্তু আপিস যায়, রেডিও চালায়। পিয়ন যাকে সামনে পায় তার হাতেই দু'ঘরের চিঠি দেয়। তাদের চিঠি সঞ্জীব বা আশার হাতে দিলে পিয়নকে ফিরিয়ে দেয়, বলে, আমাদের চিঠি নয়।

বলে ঘরে চলে যায়।

সঞ্জীব আপিস গেলে আশা ঘরে তালা দিয়ে রান্না ঘরে যায়—দশ মিনিটের জন্য নাইতে গেলেও ঘরের দরজায় তালা পড়ে। পাশেই আছে সস্ত্রীক এক বেকার !

তবু আশার কাছেই সাধনা আধ কাপ চিনি ধার করেছিল। কি করে করেছিল কে জানে ?

আশা গয়না পরে কম। হাতে দু'গাছা করে চুড়ি আর গলায় একটি হার। ভাল ভাল রঙীন শাড়ী ছাড়া তার সাধারণ কাপড় একখানাও নেই, তার বাড়ীতে ব্যবহারের জামাও বিশেষ ধরণে ছাঁটা। খোঁপা সে বাঁধে না, কিন্তু পাকানো চুলের যে দলাটি ঘাড়ের কাছে ঝোলে খোঁপার চেয়ে তাঁর বাঁধন শক্ত মনে হয়—সাধনা তো কখনো খসতে ছাখে নি। বাড়ীতে সব সময়ে সে স্যাণ্ডেল পায়ে দেয়।

তাকে দেখলেই টের পাওয়া যায় গয়ণা তার যথেষ্টই আছে কিন্তু বেশী গয়ণা গায়ে রাখা সে অসভ্যতা গ্রাম্যতা মনে করে।

ন'টার আগেই সঞ্জীব নাইতে যায়। ফর্সা রোগা মানুষটা অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারীর মত দেখতে। উঠানটুকু পার :হবার সময় পলকের জন্য সে একবার সাধনার রান্নার যায়গাটুকুর দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে।

হঠাৎ কি মনে হয় সাধনার, ছেলেকে কোলে নিয়ে একটা চায়ের কাপ হাতে সে যায় বাসন্তীর কাছে। বলে, আধ কাপ চিনি ধার দেবেন ?

ঃ ধার দেব না। আধ কাপ চিনি আবার ধার দেব কি রকম ভাই ?

ঃ আজকাল চিনি কি এমনি নেওয়া যায়, না দেওয়া যায় ? বাসন্তী কাপটা ভর্তি করে চিনি এনে দিয়ে হেসে বলে, এখন

আমার বাড়তি আছে। আমার যখন দরকার হবে, আমিও গিয়ে খানিকটা চেয়ে আনব।

সাধনা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে। আশার কাছে আধ কাপ চিনি ধার নেওয়ায় ধাক্কায় এই সহজ আদান প্রদানের সম্পর্কটা সে ভুলতে বসেছিল?

ফিরে গিয়ে আধ কাপ চিনি নিয়ে সাধনা আশার রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বলে, আপনার চিনিটা দিদি।

সঞ্জীব তাড়াতাড়ি নাওয়া সেরে ইতিমধ্যে খেতে বসেছিল। সে মুখ তুলেও চায় না।

সাধনা বলে, আপনার আপিসটা কোথায়?

সঞ্জীব বলে, ক্লাইভ ষ্ট্রীটে।

ঃ এখন কি ক্লাইভ ষ্ট্রীট আছে? নতুন কি নাম হয়েছে না?

গায়ের জোরে সাধনা যেন ওদের উদাসীনতাকে উপেক্ষা করে আশাকে পর্য্যন্ত ডিঙ্গিয়ে একেবারে সঞ্জীবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করবে! ভাব করলেই বেকার তারা অনুগ্রহ চেয়ে বসবে ভেবে তোমাদের যতই মিছে আতঙ্ক থাক, সে যেন তা গ্রাহ্য করবে না!

চিনিটা ঢেলে রেখে আশা খালি কাপটা এগিয়ে দেয়। তবু নড়ে না সাধনা।

সত্যবাবুর কাছে টাকা পেয়ে রেশন আর তরকারী আনলে তবে তার আজ রান্নাবান্নার হাঙ্গামা। সামনে মানুষ থাকতে কেন সে অবসরের সময় দুটো কথা কইবে না?

আশা তাকে বসতে বলে না। বিব্রত সঞ্জীব খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় হঠাৎ বলে, আপনি বসুন?

আশার দিকে একনজর তাকিয়ে সাধনা হেসে বলে, না যাই, কাজ আছে।

নিজের ঘরে গিয়ে তার কান্না আসে। মনে হয় গায়ের জোরে সে যেন সঞ্জীবের কাছে সার্টিফিকেট আদায় করেছে যে সেও একটা মানুষ, একজন বেকার মানুষের বৌ হলেও। এ রকম সার্টিফিকেটের দরকারও তার হচ্ছে?

ছি ছি!

বাইরে থেকে ডাক আসে, রাখালবাবু আছেন? রাখাল-বাবু?

রাজীবের গলা। মোটাসোটা কালো মানুষটিকে সাধনা চোখে দেখেছে, সামনা সামনি এ পর্য্যন্ত কখনো ওর সঙ্গে কথা বলে নি। বাড়ীতে গেলে রাজীব নিজেই তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তার পর্দ্দা রক্ষা করে।

বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে সাধনা বলে, উনি তো বাড়ী নেই।

ঃ তবে তো মুস্কিল হল!

ঃ কিছু বলার থাকলে বলে যান।

রাজীব ইতস্ততঃ করে বলে, রাখালবাবু চাকরী খুঁজছেন—একটা খবর পেয়েছিলাম। আজকেই ওনার যাওয়া দরকার। তা আমি তো বেরিয়ে যাচ্ছি—

: আপনার আপিসের ঠিকানাটা দিয়ে যান, উনি গিয়ে দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। কখন যাবেন ?

রাজীব একেবারে ছাপানো ঠিকানা তাকে দেয়—কার্ড নয়, একটা ছাপা বিলের মাথাটা ছিঁড়ে দেয়। সাধনা জানত রাজীব লেখাপড়া বেশী করে নি, তার কথার ধরণ ও চালচলনে সে অল্প শিক্ষিত ছোট ব্যবসায়ীর সেকেলে ভোঁতা ভাবটাই পুরোমাত্রায় প্রত্যাশা করছিল। আজ সামনাসামনি মানুষটার সঙ্গে কথা বলে সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। মার্জিত রুচি শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে কোনই তো তফাৎ নেই তার! এই রাজীবের ব্যবসা বিড়ির পাতা আর বিড়ির তামাকের! সুখা আর পাতা বেচে, তাও বন্ধুর সঙ্গে ভাগে, বাসন্তীকে গায়ে সে এত গয়ণা দিয়েছে! লুকিয়ে বাসন্তী এত টাকা জমিয়েছে যে তার ভাঙ্গা হারটা কিনে টাকার একটা অংশকে সোনা করে জমানো সে সুবিধাজনক মনে করে!

রাজীব জানায় বারটা সাড়ে বারোটার মধ্যে রাখাল যেন যায়। রাখালকে সঙ্গে নিয়ে চেনা একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, সে আবার রাখালকে নিয়ে যাবে যে আপিসে চাকরী খালি আছে—হাঙ্গামা অনেক!

হাঙ্গামা বৈকি। ঘরে গিয়ে সাধনা তাই ভাবে। এমন লোকও আছে জগতে আপনজনকে চাকরী জুটিয়ে দেওয়া যাদের কাছে ডাল ভাত—মায়ের পিসতুতো ভাই সম্পর্কে এমনি একজন মামা থাকায় ওই বাগানওলা বাড়ীর হাবাগোবা ছেলে কুমুদ চাইতে না চাইতে তিনশ' টাকার

চাকরী পেয়ে গেছে। কিন্তু বিড়ির পাতা আর তামাকের ছোটখাট ব্যবসায়ী রাজীব তো সে দরের বা স্তরের মানুষ নয়, এ বাজারে একজনকে চাকরী জুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাটাই তার পক্ষে হাঙ্গামার ব্যাপার বৈকি!

স্বেচ্ছায় যেচে সে এই হাঙ্গামা করতে চায় কেন?

রাখাল তার আত্মীয়ও নয়, বন্ধুও নয়। ভালরকম জানাশোনাও নেই তাদের মধ্যে। রাখালের চাকরীর জন্য তার এত মাথাব্যথা কেন?

বাসন্তী বলেছে?

বাসন্তী কেন রাখালকে চাকরী জুটিয়ে দেবার কথা রাজীবকে বলবে? তার স্বার্থ কি?

সাধনা নিশ্বাস ফেলে। ঠিকমত বোঝা গেল না। শুধু ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থ নিয়ে যে জগৎ চলে না, এ কি তারই একটা প্রমাণ? আধ কাপ চিনি ধার চাইতে যেতে বাসন্তী কি রকম খুসীতে ডগমগ হয়ে কাপ ভর্তি চিনি দিয়ে বলেছিল যে ধারের কারবার তাদের মধ্যে নয়, বার বার সে দৃশ্য মনে আসে। মনে আসে তার হারটি কিনতে চাওয়ার ভূমিকা করা। এভাবে হারটা কিনতে চাওয়ায় পাছে তাকে অপমান করা হয়, সে রাগ করে, এজন্য সত্যই ভয় ছিল বাসন্তীর!

রাজীবের সঙ্গে বাসন্তীর অনেক অমিল, অনেক বিষয়ে রাজীবকে তার অবিশ্বাস। শুধু রাজীবের বেলা নয়, পুরুষ মানুষ সম্পর্কে বাসন্তীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বড় কম। এটা বাসন্তী গোপনও করে না এবং সাধনাও আগেই টের পেয়েছিল।

পুরুষ রাখাল তার ভাঙ্গা হারটা দোকানে বেচতে যাবে এ চিন্তা কি অসহ্য ঠেকেছে বাসন্তীর? জমানো টাকা সোণা করতে চায় এসব কি তার বানানো কথা? আসলে তার অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে সে ব্যবস্থা করতে চায় যে পুরুষ এবং স্বামী রাখালের বদলে সে যাতে হারটা নিজেই বেচতে পারে, নগদ টাকাটা যাতে সে-ই হাতে পায়?

অথবা এ সমস্ত তারই উদ্ভট কল্পনা?

জানালা দিয়ে দেখা যায় পাড়ার ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। ছেলেরা একলা অথবা দু'তিন জনে একসাথে, মেয়েরা আট দশজনে দল বেঁধে। সেও এমনিভাবে স্কুলে যেত, বেশীদিনের কথা নয়। তখনও টের পেত বাপের তার অভাবের সংসার। ওই ছেলেমেয়েরাও কি টের পায় আজকের সংসারের ভয়াবহ অভাব—দু'চার জন ছাড়া? কোন মন্ত্রে বয়স কমে গিয়ে একবার যদি সে ভিড়ে পড়তে পারত ওদের দলে! নিদারুণ অস্থিরতা জাগে সাধনার, একটু ছটফট করে বেড়াবার যায়গা পর্য্যন্ত তার নেই। এই একখানা ঘরে সে একা। তার কাজ নেই, বেঁচে থাকার মানে নেই। এক পোয়া দুধ জ্বাল দিয়ে আর এক মুঠো ডাল সিদ্ধ করে উনানটাকে নিভতে দিয়ে তার শুধু প্রতীক্ষা করে থাকা যে কতক্ষণে দু'টি চাল আসবে শাকপাতা আসবে, আবার উনান ধরিয়ে ভাত তরকারী রাঁধবার সুযোগ পাবে!

বাক্স খুলে সাধনা ভাঙ্গা হারটা বার করে। খোকা

ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে তাকিয়েও ছাখে না। আবার সে বাসন্তীর কাছে যায়।

বাসন্তী চুলে তেল দিচ্ছিল, নাইতে যাবে। আজকেই আগে সে হু'বার বাসন্তীকে দেখেছে—গায়ে শুধু তার গয়ণার আবরণ নয়, মোটা ছিটের জামা কাপড় যেন বোরখার মতই গলা থেকে গোড়ালি পর্য্যন্ত তার নারীত্বকে ঢেকে রেখেছিল।

এখন শুধু ফিনফিনে একখানা পাতলা কাপড় আলগাভাবে গায়ে জড়ানো।

রাজীব বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই দেহকে সে আড়াল থেকে মুক্তি দিয়েছে।

: কি হয়েছে ভাই?

: কিছু হয় নি। হারটা সত্যি কিনবেন?

: কিনব না? আমি কি তামাসা করছিলাম আপনার সঙ্গে?

: তবে কিনে নিন।

বাসন্তী দ্বিধার সঙ্গে বলে, ওজন হল না, আজকে সোনার দর কত জানা নেই—

সাধনা বলে, ওজন তিন ভরি ধরুন। দোকানের রসিদ এনেছি, তিন ভরি দেড় আনা ওজন লিখেছে, দেড় আনা বাদ দিন। সোনার দর কাগজেই আছে—

বাসন্তী হঠাৎ হাসে, তাতো আছে, কিন্তু সোণামণিই যে নেই।

: তার মানে?

: তুমি বোন বড্ড ছেলেমানুষ।

সাধনা ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

বাসন্তীও গম্ভীর হয়ে বলে, ঝোঁকের মাথায় ছুটে এলে; একবার ভাবলেও না আরেকজনকে গোপন করে এটা আমায় বেচে দেয়া যায় না? সে ভদ্দরলোকের কিছু জানা না থাকলে বরং আলাদা কথা ছিল। মেয়েদের অমন আড়ালে আড়ালে অনেক কিছু করতেই হয়। কিন্তু এটা জানা বিষয়, তুমিই এটা নিয়ে কত পরামর্শ করেছো মানুষটার সঙ্গে। তাকে একেবারে বাদ দিয়ে কি এটা বেচতে পার?

: আমার জিনিষ—

: হোক না তোমার জিনিষ। এতো শুধু তোমার সোনার জিনিষ। তুমি নিজে কার জিনিষ? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছ? একেবারে বরবাদ করে দিয়েছ মানুষটাকে? যতকাল বাঁচবে কথাও কইবে না, পাশেও শোবে না তো?

সাধনা বলে, তুমি সত্যি আশ্চর্য্য মানুষ!

বাসন্তী বলে, তুমি সত্যি ছেলেমানুষ। মেয়েছেলে দশ বছরে পেকে ঝানু হবে, পনের বছরে রসাবে। বুড়োমি পাকামি সব তলিয়ে থাকবে রসে। নইলে কি ব্যাটাছেলের সঙ্গে পারা যায়? ছেলেমানুষ রয়ে গেলে আর উপায় নেই, সে বেচারার অদেষ্ট মন্দ!

: এত ফন্দি এঁটে চলতে হবে?

: আরে কপাল! এ নাকি ফন্দি আঁটা, মতলব আঁটা? মেয়েছেলেদের চালচলন স্বভাব হবে এটা। ব্যাটাছেলের

মত ব্যাটাছেলে হবে, মেয়েছেলের মত মেয়েছেলে হবে, যেমন সংসার যেমন নিয়ম। তাতে ফন্দি আঁটার কি আছে? বুঝে শুনে চলবে না তো কি বোকাহাবা হবে মানুষ? ছেলে-মানুষের মত ঝোঁকের মাথায় চলবে? সাধ করে জেনেশুনে সুখশান্তি নষ্ট করবে? না ভাই, ওটা মোটে কাজের কথা নয়।

ছেলের কান্না শুনে সাধনা তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে। বাড়ীতে পা দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে ছাখে, তার ছেলে আজ আশার কোলে উঠেছে!

তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চেয়ে ঝাঁঝালো গলায় আশা বলে, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? একলা ফেলে রেখে গেছ ছেলেটাকে? রোয়াক থেকে পড়ে মাথাটা যে ফাটে নি—

ঃ একলা কেন? তুমি তো ছিলে।

সাধনা হাসে, কিন্তু আশা গম্ভীর মুখেই ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যায়। এ তো হাসি তামাসার কথা নয়!

রেশন, কিছু তরকারী আর আধ পোয়া মাছ নিয়ে রাখাল বাড়ী ফেরে। সত্যবাবুর কাছে মাস'ভর খাটুনির মজুরির টাকা আজ সে আদায় করে ছেড়েছে। তার চাইবার ধরণ দেখে আজও তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবার সাহস সত্যবাবুর হয় নি।

সাধনার কাছে রাজীবের কথা শুনে সে বলে, ভাঁওতা বোধ হয়।

ঃ তোমাকে ভাঁওতা দিয়ে মানুষটার লাভ কি ?

ঃ কে জানে কি মতলব আছে। সোজাসুজি আমায় বললেই হ'ত।

স্থির দৃষ্টিতে সে সাধনার দিকে চেয়ে থাকে।

তরকারী কুটবে কি, সে দৃষ্টি দেখে মাথা ঘুরে যায় সাধনার।

ঃ সারাদিন বাইরে কাটাও, কখন তোমার দেখা পাবেন ?

ঃ পাশাপাশি ঘর, ইচ্ছা থাকলে আর দেখা হত না ? রাত্রে তো বাড়ী ফিরি আমি ?

সাধনা চুপ করে থাকে। রাখালের একটা চাকরী বাগিয়ে দেবার জন্য বাসন্তী রাজীবের উপর চাপ দিয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা নিয়ে গিয়েও মুখ ফুটে বাসন্তীকে সে কিছু বলতে পারে নি। কুণ্ঠা বোধ করেছে। মনে হয়েছে বাসন্তী যদি আড়ালে থেকে তার ভাল করতে চেয়ে থাকে এ বিষয়ে তাকে আড়ালে থাকতে দেওয়াই ভাল।

বাসন্তী যেচে তার সঙ্গে ভাব করতে চায়, কেন চায় সে হিসাবটা এখনো সাধনার ঠিক হয় নি বলে এই কুণ্ঠা। বাসন্তী যদি তার প্রশ্নের জবাবে সহজভাবে হেসে বলেই বসে যে, হ্যাঁ ভাই, আমিই ওকে বলেছি,—কি ভাষায় কিভাবে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে সাধনা ? নিজের মান বাঁচিয়ে জানাবে ?

রাজীবের ঠিকানা লেখা কাগজটা নাড়তে নাড়তে রাখাল আবার ব্যঙ্গের সুরে বলে, আমার জন্ম হঠাৎ এত দরদ জাগল কেন ? আমি তো ভদ্দরলোককে চাকরী খুঁজে দিতে বলিনি

চাকরী কি না গাছের ফল, যেচে যেচে প্রতিবেশীদের বিতরণ করেন।

এবার সাধনা শান্ত সুরে বলে, অন্য কারণও তো থাকতে পারে?

: কি কারণ? ভাল জানাশোনা পর্য্যন্ত নেই—

: তোমাদের নেই, ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার ভাব আছে।

: ও, তাই বল! পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে তাদের স্বামীদের দিয়ে তুমি আমার চাকরী জোটাবার চেষ্টা করছ? বেশ, বেশ—এবার তাহলে আর ভাবনা নেই!

রাখাল একখানা চিঠি লিখতে বসে। চিঠিখানা রাখাল তিনশো মাইল দূরে তার ভাইএর কাছে লিখছে জানতে পারলে সাধনার মাথা আরও ঘুরে যেত। হাতের কাজ করতে করতে সে বাসন্তীর সহজ বাস্তববুদ্ধির কথা ভাবে—বাসন্তী ঠিক বলেছে। তারা কত শিক্ষিত ভদ্র ভালমানুষ, তাদের মধ্যে কত বিশ্বাস আর ভালবাসা এসব গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে সোজাসুজি বলে দিয়েছে যে রাখালকে অন্তত একবার না জানিয়ে হারের ব্যবস্থা সে করতে পারে না, ওটা সংসারের নিয়ম নয়!

নিয়ম নয় এই হিসাবে যে শুধু এই গোপণতাটুকুর জন্য স্বামীকে যা খুসী তাই ভাববার সুযোগ দেওয়া হয়। রাখাল পছন্দ করুক বা না করুক, তার অবাধ্যতায় যতই রাগ করুক, গুরুতর মনোমালিন্য ঘটে যাক—সে হবে আলাদা কথা। রাখালকে জানিয়ে কাজটা করলে রাখাল কোনমতেই এটাকে

তার সামনাসামনি বিদ্রোহ করার অতিরিক্ত অন্য কিছু বানাতে পারবে না। না জানিয়ে করলে যা খুসী মানে করতে পারবে তার কাজের।

তাই বটে। এমনিই রীতি এ সংসারের। তারাও বাদ নয়। রাখালকে না জানিয়ে সে ভাব করেছে বাসন্তীর সঙ্গে শুধু এই জন্যই এমন অসম্ভবও সম্ভব হল। গোপন করার ইচ্ছা থাক বা না থাক, জানাবার কথা মনে আসে নি আর প্রয়োজন বোধ করে নি বলেই হোক, সেজন্য কিছুই আসে যায় না। স্বামীকে না জানিয়ে পাড়ার একটি বৌয়ের সঙ্গে ভাব করেছে এটাই হল আসল কথা।

রাখাল তাই নানারকম মানে করতে পেরেছে অতি সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনার। রাজীব যেচে তার চাকরী করে দিতে চায়, কেন সে যখন বাড়ী থাকে না ঠিক সেই সময়ে কথা বলতে আর ঠিকানা দিতে আসে সাধনার কাছে, তারই মানে।

ধারালো মানে, কাঁটা ভরা মানে। তুজনেরি মনকে যা কাটবে আর বিঁধবে।

মনের মধ্যে মানে করতে করতে তাই সে ওরকম স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকতে পেরেছে।

এও তবে সম্ভব জগতে? রাখালের পক্ষে এসব কথা ভাবা?

কলের মত কাজ করে যায় সাধনা। জগৎ সংসারে যেন জীবনের জোয়ার ভাঁটা নেই, স্তব্ধ থমথমে হয়ে গেছে সব।

ভাত নামায়, আলু কুমড়ার তরকারী চাপায়, আধপোয়া মাছ সাঁতলে ঝোল করে—তারই ফাঁকে ফাঁকে ছেলেকে আধ-শুকনো মাই চুষতে দেয়।

এসব যেন অন্য কেউ করছে, সাধনা নয়।

কত বিশ্বাস, কত ধারণা, কত সংস্কার যে তার মিথ্যা হয়ে গেছে এই একটা অসম্ভব সম্ভব হওয়ায়—যা সম্ভব কি অসম্ভব এ বিষয়ে চিন্তা পর্য্যন্ত করার দরকার হয় নি এতদিন, সেটা একেবারে কঠোর বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেওয়ায়। উনান নিভে এসেছে।

কয়লা রাখার পুরাণো ভাঙ্গা বালতিটার দিকে চেয়ে সাধনার হঠাৎ হাসি পায়। একটুকরো কয়লা নেই। অন্ততঃ পাঁচ সের কয়লা এনে দেবার জন্য রাখালকে বলতে হবে। নইলে মাছের ঝোল নামবে না।

ঘরে গিয়ে তাক থেকে একটা বই নিয়ে আসে—মস্ত এক গয়ণার দোকানের ক্যাটালগ। কত প্যাটার্নের সাধারণ অসাধারণ কত রকমের সোণা আর জড়োয়া গয়ণার ছবিশুদ্ধ তালিকাই যে বইটাতে আছে। যত্ন করে তাকে তুলে রেখেছিল—কোনদিন যদি দরকার হয় প্যাটার্ণ বেছে পছন্দ করার।

পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উনানে দিয়ে সে ঝোলটা রাঁধে।

রাখাল এসে লেখা চিঠিখানা তার হাতে দেয়। তার দাদা প্রসন্নকে নিজের নিরুপায় অবস্থার কথা খুলে লিখে রাখাল জানিয়েছে যে সাধনা যদি মাস তিনেক গিয়ে তার

কাছে থেকে আসে তাহলে বড়ই উপকার হয়। ইতিমধ্যে রাখাল তার সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে।

পড়ে চিঠিটাও সাধনা উনানে গুঁজে দেয়।

ঃ তুমি যাবে না ?

ঃ না।

ঃ ভায়ের কাছে বোন যায় না ?

ঃ এ অবস্থায় যায় না।

রাখাল ব্যঙ্গ করে বলে, এ অবস্থায় আত্মীয়ের বিয়ে বাড়ীতে মানুষ নাচতে নাচতে যায়, ভায়ের বাড়ী যায় না, না ?

সাধনা কড়াই কাত করে মাছের ঝোল উনানে ঢেলে দিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

৪

রাখাল স্নান করে নিজেই ভাত বেড়ে খায়। ডাল তরকারী দিয়ে খায়।

বড় মাছের আধপোয়া পেটি এনেছিল সাত আনা দিয়ে। চমৎকার ছিল মাছটা। পোড়া মাছের গন্ধ শুঁকেই খাওয়ার সাধ মেটাতে হল।

খেয়ে উঠেই জামা গায় দেয়। বলে, কই, ঠিকানাটা দাও।

ঃ পুড়িয়ে ফেলেছি।

ঃ বন্ধুর কাছ থেকে জেনে এসো।

ঃ তোমার এ চাকরী করতে হবে না।

রাখাল কাঠের চেয়ারটাতে বসে। বলে, তোমার কি মাথা বিগড়ে গেল? একজন চাকরী করে দিচ্ছে, চেষ্টা করব না? তার মনে যাই থাক—

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে সাধনা ফোঁস করে ওঠে, মাথা বিগড়েছে তোমার, আমার নয়। বারবার বলছি মানুষটার সঙ্গে আগে আমার একটা মুখের কথা পর্য্যন্ত হয় নি, শুধু ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ, তবু তোমার ওই এক চিন্তা!

গলা চড়িয়ে চীৎকার করে সাধনা যোগ দেয়, ভদ্রলোকের মনে কিছু নেই, থাকতে পারে না! যদি কিছু থাকে সব তোমারি মগজে।

ঃ তবে তো কথাই নেই। ঠিকানাটা জেনে এসো।

রাখালের শান্তভাবে সাধনা বড়ই দমে যায়। ঝিমিয়ে গিয়ে গভীর একটা হতাশা বোধ করে।

নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমিই জেনে যাও।

রাখাল বলে, সেই ভাল। যাবার সময় চাকরটার কাছেই জেনে যেতে পারব।

রাখাল বেরিয়ে যায়। সাধনার হারের কথা উল্লেখও করে না!

রাখাল বেরিয়ে যাবার খানিক পরেই ভোলার মা দরজার বাইরে থেকে ডাকে, খোকার মা কি করেন?

সাধনা শ্রান্ত কণ্ঠে বলে, ডিম রাখব না ভোলার মা।

ঃ একটা কথা ছিল।

শিথিল আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে সাধনা উঠে আসে, কি বলবে বল ?

ভোলার মা তার মুখের থমথমে ভাব নজর করে ছাখে, কিন্তু কিছুই বলে না। জিজ্ঞাসাও করে না যে তোমার জ্বর এসেছে নাকি ? কিসের প্রক্রিয়ায় এমন হয় সে ভাল করেই জানে। কথায় এর প্রতিকার নেই।

বলে, ভিতরে একটু আড়ালে গিয়া কমু কথাটা। আর কিছু না, একটা পরামর্শ দিবেন।

এত মানুষ থাকতে তার কাছে ভোলার মা পরামর্শ চায় ?

ঃ ঘরে এসো।

ঘরে ঢুকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে ভোলার মা বলে, অন্য মাইন্‌ষেরে জিগাইতে সাহস পাইলাম না। কার মনে কি আছে কেডা কইবো ?

বলতে বলতে সযত্নে আঁচলের কোণে বাঁধা এক জোড়া সোণার মাকড়ি বার করে, সাধনার সামনে রেখে বলে, আর কিছু নাই, এইটুক্ সোনা সম্বল ছিল।

ভোলার মার কয়েকটা টাকা দরকার। মাকড়ি দুটো বাঁধা রাখবে। কার কাছে গেলে ভাল হয় যদি বলে দেয় সাধনা ? যার কাছে গেলে কাজও হবে, জিনিষটা গচ্ছিত রেখে ভোলার মাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে ?

ঃ বাঁধা রাখবে ? বেচবে না ?

ঃ না, বেচুম না। সবই তো বেইচা দিছি, এই একখান চিহ্ন রাখুম।

কিসের চিহ্ন? প্রথম বয়সে ভালবেসে ভোলার বাবা মাকড়ি দুটো কিনে দিয়েছিল তাকে।

আজও ভোলার মার কাছে মূল্যবান হয়ে আছে স্বামীর প্রথম বয়সের ভালবাসা! সে দিনগুলি স্বপ্নের মত বহুদূর পিছনে পড়ে আছে—সোণার মাকড়ি দুটি তার বাস্তব প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে মিথ্যা স্বপ্ন নয়, সত্যই একদিন জীবনে এসেছিল সেই দিনগুলি!

ঃ কি ভাবেন?

সাধনা লজ্জা পায়—নিজের কাছে। সে-ই ভোলার মার অতীত স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল।

ঃ আমার টাকা নেই।

ঃ আপনে যদি না পারেন, কইয়া ছান না কার কাছে যামু?

ঃ তাই বা কার নাম করি বল? কে নেবে কে নেবে না—

ভোলার মা চুপ করে থাকে।

ঃ দু'একজনকে বলে দেখতে পারি।

ঃ বৈকালে আসুম?

ঃ এসো।

ভোলার মা মাকড়ি দু'টি বাড়িয়ে দেয়। সাধনা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, রেখে যাবে?

ঃ যারে কইবেন, জিনিষটা দেখাইবেন না?

ভোলার মা চলে যাবার পর সাধনা ধীরে ধীরে বুঝতে

পারে সে কেন বিশেষ করে তার কাছে এসেছিল। ভোলার মা টের পেয়ে গেছে তার অবস্থা। সেও নামতে আরম্ভ করেছে ভোলার মার স্তরে, তাদের হু'জনেরি অবস্থা খানিকটা ইতরবিশেষ।

সে তাই অনেকটা কাছের মানুষ ভোলার মার! সে সহজেই বুঝবে ভোলার মার কথা, সহজেই অনুভব করতে পারবে মাকড়ি বাঁধা রেখে কটা টাকা পাওয়া তার কাছে কতখানি গুরুতর ব্যাপার! অন্যে তো এতখানি মর্য্যাদা দেবে না ভোলার মার প্রয়োজনকে!

হয় তো গায়েই মাখবে না তার কথা। হয় তো সন্দেহ করবে নানারকম। আধঘণ্টা জেরা করে বলবে, তুমি অন্য কোথাও চেষ্টা কর!

তাই, আশা যদিও প্রায়ই তার কাছে ডিম রাখে, নানাকথা জিজ্ঞাসা করে এবং মাকড়ি বাঁধা রেখে টাকাও সে অনায়াসে দিতে পারে তাকে, তবু, আগে সে পরামর্শ চাইতে এসেছে সাধনার কাছে।

খেয়ে উঠে ঘরে তালা দিয়ে সাধনা বাসন্তীর কাছে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় তার ভাঙ্গা হার। বলে, তুমি তো এমনি নেবে না হারটা, দোকানে যাচাই না করে?

বাসন্তী বলে, নেয়া কি উচিত? তুমিই বল ভাই? বেশী দিলে ভাববে দয়া করেছি, কম দিলে ভাববে ঠকিয়েছি।

তবে চলো দোকানে যাই। যাচাই করিয়ে আসি।

বাসন্তী গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা, তুমি আমি একলাটি যাব? কিছু যদি হয়?

সাধনা হেসে বলে, কি হবে? বাঘে খাবে? পুরুষের চেয়ে মেয়েদের রাস্তায় ভয় কম, তা জানো? তুমি যদি মিথ্যে করে একজনের নামে বল, এ লোকটা অভদ্রতা করেছে, কেউ আর তার কথা কাণেও তুলবে না, দশজনে মিলে মেরে তার হাড় গুঁড়ো করে দেবে।

বাসন্তী মাথা নেড়ে বলে, সেটাই তো খারাপ। আমরা যেন মানুষ নই, ইয়ে! রাস্তার মানুষের কাছেও আমরা আহ্লাদী

দুপুরবেলার আলস্যে আর শৈথিল্যে যেন থৈ থৈ করছে বাসন্তী, দেখে মনে করা দায় যে সেও আবার ভাল করে গা ঢাকে, উঠে চলে ফিরে বেড়ায়, সংসারে গিন্নিপনা করে। সে পছন্দ করে না, কিন্তু উপায় কি, পুরুষের কাছে মেয়েরা আহ্লাদী। খারাপ হলেও নিয়মটা মেনে নিয়ে সে দুপুরবেলা ঘরের কোণে একা থাকার সময়েও আহ্লাদী হয়েই আছে। যে ভূমিকা অভিনয় করতেই হবে বরাবর, দু'দণ্ডের জন্য তার হাবভাব চালচলন ছাঁটাই করে রেখে তার লাভ কি?

গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হাই তুলে উঠে দাঁড়ায়। বলে, মানুষটা ফিরলে বলতে হবে তোমার সাথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

: মিছে কথা বলবে?

: মিছে কথা? তোমার যেন সবতাতেই খুঁতখুতানি।

মিছে কথা কিগো ? তোমার সাথে দুপুরবেলা বেরিয়েছিলাম এটুকু শুধু জানাব মানুষটাকে। সত্যি সত্যি তো বেরুচ্ছি তোমার সাথে।

ঃ যদি জিজ্ঞাসা করেন কোথা গিয়াছিলে, কেন গিয়েছিলে ?

ঃ ইস্! জিগ্যেস করলেই হল। আমি কি বাঁদী নাকি, খুটিয়ে খুটিয়ে সব বলতে হবে? বেরিয়েছিলাম, জানিয়ে দিলাম, ফুরিয়ে গেল। কোথা গেছিলাম, কি করেছিলাম, খুসী হয় বলব, খুসী হয় বলব না—জিগ্যেস করলেই বলতে হবে নাকি আমায়।

সাধনাকে খালি ঘরে একলা রেখে সে বাথরুমে যায়। আশার ঘরে এত দামী দামী জিনিষ নেই, আশার বাক্সে এত টাকা আর গয়না নেই—আশা পারত না।

দু'জনে বাসে চেপে গয়নার দোকানে যায়। মস্ত দোকান, সারি সারি কাঁচের শো কেশে ঝলমল করছে হরেক রকমের গয়না। কত নাম, কত বৈচিত্র্য, কত রকমের রুচির কাছে কত ধরণের আবেদন। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে একটু ভয় ভয় করে, একটু ছম ছম করে গা।

শত শত মেয়েলোকের মনপ্রাণ রূপযৌবন যেন রূপক হয়ে ঝলমল করছে শো কেসে।

৫

রাজীব বলে, আসুন রাখালবাবু, বসুন। একটা সিগারেট খান!

একটা টুল এগিয়ে দেয়। পার্টনার দীননাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, কি আশ্চর্য্য যোগাযোগ দেখুন মশাই, কাল দীনুর কাছে শুনলাম চাকরীটার খবর, আজ খেয়ে দেয়ে দোকানে বেরুব, স্ত্রী জানালেন আপনি নাকি চাকরী খুঁজছেন। ভাবলাম কি, এমন সুযোগ তো ছাড়া ঠিক নয়। একে প্রতিবেশী, তায় আবার গিন্নির বন্ধুর হাজব্যাণ্ড! লাগিয়ে দিতে পারি তো আমায় পায় কে? ঘরে খাতির, আপনাদের কাছে খাতির!

রাজীব একগাল হাসে।—আপনাতে আমাতে বেশী আলাপ হয় নি, স্ত্রীরা দু'জন বেশ জমিয়ে নিয়েছেন!

অনর্গল কত কথাই যে বলে রাজীব পাঁচসাত মিনিটের মধ্যে! বাড়ীতে বাসন্তীর সঙ্গে ঝগড়ার সময় ছাড়া তার গলা একরকম শোনাই যায় না। বাড়ীতে কম কথা বলাটা বোধ হয় বাইরে পুষিয়ে নেয়!

বলে, কিন্তু দাদা, যদি ফসকেই যায়, রাগ করবেন না যেন।

ঃ না না, রাগের কি আছে? আমার জন্য চেষ্টা করেছেন এটা কি কম কথা হল!

যদি ফসকে যায়! যদি! চাকরী হওয়া সম্পর্কে এরা এতখানি সুনিশ্চিত যে না-হওয়াটা নিছক "যদির" কথা! আশায় রাখাল অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

দীননাথ বলে, তুমি তো একধার থেকে বকে চলেছ। কোথায় চাকরী কি চাকরী সে সব বিত্তান্ত বল ভদ্দরলোককে? ওঁরও তো পছন্দ অপছন্দ আছে?

ঃ সে তো তুমি বলবে।

দীননাথ অত্যন্ত শীর্ণ মানুষ। গায়ের হাড়গুলি যেন তার পাঞ্জাবী ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। কথা বলার সময় থেকে থেকে চোখ মিটমিট করে। রঙ খুব ফর্সা। চেহারায় সে যেন একেবারে রাজীবের রূপধরা বিপরীত।

দীননাথ বলে, আপনি বন্ধু মানুষ, খুলেই বলি আপনাকে। আপিসটা আমার এক আত্মীয়ের। ব্যাপারটা হল কি জানেন, ইনকামট্যাক্সের চোটে তো আর করে খাবার পথ নেই মানুষের। কর্ত্তাদের একটু কড়া দৃষ্টি পড়েছে এই আত্মীয়টির ওপর। কাগজেকলমে একটা পোষ্ট আছে—সেলস অর্গানাইজার। আপিস টাপিসে আসেন না, ঘুরে ঘুরে সেলস অর্গানাইজ করে বেড়ান আর মাসে মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে নেন। বুঝলেন না?

দীননাথ নিজের মনেই হাসে—নীরবে। শব্দ করে হাসাটা বোধ হয় তার আসে না।

বলে, তা, এবার একবার মানুষটার সশরীরে হাজির হওয়াটা দরকার পড়ে গেছে। ওরা বলছে, তোমাদের এইটুকু

কারবার, পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে সেলস্ অর্গানাইজার রেখেছো? মজাটা দেখুন একবার। আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে অর্গানাইজার রাখি, আর হাজার টাকা দিয়ে রাখি, তোদের কিরে বাপু? বাজার ধরতে লোকে গোড়ায় টাকা ঢালে না, লোকসান দেয় না? কিন্তু তা বললে চলবে না, প্রমাণ দিতে হবে ওই পোষ্টে সত্যি লোক আছে।

রাখাল চুপ করে শুনছিল। আশা ঘুচে যাওয়ায় সে স্বস্তি পেয়েছে। তার বদলে এবার যেন রাজীব কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে মনে হয়।

রাখাল বলে, আমাকে ওই কাজে লাগাবেন?

ঃ ঠিক ধরেছেন! আপনার মত লোক হলেই ভাল। অনেককাল অন্য আপিসে কাজ করেন নি, কেউ বলতে পারবে না আপনি এ পোষ্টে ছিলেন না।

রাখাল মৃদু হেসে বলে, পাঁচশো টাকাই পাব তো আমি?

দীননাথও মুচকে হেসে বলে, দু'একমাস পাবেন বৈ কি! তবে কি জানেন, এ বাজারে পাঁচশো টাকা মাইনের লোক রেখে কি ব্যবসা চলে? পরে ওটা মিউচুয়ালি ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। আপনারও যাতে সংসারটা চলে, কোম্পানীরও যাতে—বুঝলেন না?

ঃ বুঝলাম বৈকি! পুরানো পে বিলে আমাকে সই করতে হবে তো? পোষ্টে যে নামে লোক আছে সে নামটাও নিতে হবে নিশ্চয়?

দীননাথ নীরবে সায় দিয়ে চোখ পিট পিট করতে করতে বলে, আপনার কোন রিস্ক নেই। রাজীবের বন্ধু মানুষ আপনি, আপনাকে করে দিতে পারি কাজটা। গোড়ায় দু'তিন মাস ওই পাঁচশো টাকাই পাবেন, তারপর এ পোষ্টটা তুলে দিয়ে অন্য একটা কাজ দেয়া হবে আপনাকে। ভেবে চিন্তে বলুন লাগবেন না কি। আরও ক'জন ক্যাণ্ডিডেট আছে, আজকেই এক জনকে লাগিয়ে দেয়া হবে। বুঝলেন না?

রাখাল লক্ষ্য করে যে রাজীবের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেছে, রীতিমত শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে তার দিকে চেয়ে আছে। তার মনোভাব রাখাল অনুমান করতে পারে। চাকরীটার মধ্যে যে এত প্যাঁচ আছে এটা তার জানা ছিল না। এখন সে পড়ে গেছে মহা দুর্ভাবনায়। রাখালের ভালমন্দের জন্য তার ভাবনা নয়, ভাবনা বাড়ীর সেই মানুষটির জন্য, যার কথায় রাখালকে সে এই চাকরীর খোঁজ দিয়েছে। রাখাল যদি মরিয়া হয়ে রাজী হয়ে যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত ফ্যাসাদে পড়ে, বাসন্তীর কাছে সহজে সে রেহাই পাবে না।

রাখাল মাথা নেড়ে বলে, না মশাই, এ কাজ আমার পোষাবে না।

রাজীব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

দীননাথ বলে, সে তো আপনার ইচ্ছা। তবে, আপনি হলেন আমাদের রাজীবের বন্ধু, ভেতরের কথা সব খুলে বলেছি আপনাকে। দেখবেন যেন—

রাখাল বলে, সে জন্য ভাববেন না। তাছাড়া, সত্যিসত্যি আসল কথা কিছুই বলেন নি আমায়। কার ব্যবসা, কোন আপিস আমি কিছুই জানি না। ইচ্ছা থাকলেও আমি কোন ক্ষতি করতে পারব না।

দীননাথ গম্ভীর হয়ে বলে, দাদা, ইচ্ছা থাকলে সবাই ক্ষতি করতে পারে।

ঃ কে জানে। তবে আমার যখন ইচ্ছাই নেই তখন আর কথা কি!

রাজীব বলে, ওসব ভেবো না দীনু, রাখালবাবু খাঁটি মানুষ। আমি জানি তো ওঁকে।

রাখাল বিদায় নিলে তার সঙ্গে রাস্তায় নেমে গিয়ে রাজীব অপরাধীর মত বলে, কিছু মনে করলেন না তো রাখালবাবু?

চাকরি যেন গাছের ফল! পচে নষ্ট হয়ে যাবে বলে মানুষ যেন প্রতিবেশীদের যেচে যেচে চাকরী বিতরণ করে!

একথা বলায় সাধনা চটে গিয়েছিল। কারো কোন মতলব না থাকলে, ভিতরে কোন প্যাঁচ না থাকলে চাকরী যেন এভাবে হাওয়ায় উড়ে এসে হাজির হয় বেকারের কাছে, ছাঁটাই বেকারি দুর্ভিক্ষের অভিশাপে কাণায় কাণায় ভরা এই দেশে।

রাজীবের মতলব ছিল শুধু বৌয়ের একটু মন যোগানো। তাতেই যেন রীতিনীতি উল্টে গিয়েছে সংসারের! এ ভাবে যে চাকরী হয়:না বেকারের এ সত্যটা মিথ্যা হয়ে গেছে। সাধনা

চায়, তাই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে বাধ্য। তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে খাতির করার জন্যই অঘটন ঘটতে হবে সংসারে।

সাধনার প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যবহার আজ নতুন হতাশা এনে দিয়েছে রাখালকে। সাধনা তার সাধারণ বাস্তব বুদ্ধি হারাতে বসেছে ভেবে তার ভয় হয়েছিল, আসলে এ বুদ্ধি কোনদিনই ছিল না তার।

তার স্বভাবে একটা ধৈর্য্য আর সংযম ছিল, সাধারণ সহজ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার একটা ভাসাভাসা বাস্তব-বোধ ছিল। তার বেশী কিছু নয়। সাধারণ হিসাবে বুদ্ধিমতী মেয়ে, সেই সঙ্গে খানিকটা ধৈর্য্য আর সংযমের সমাবেশ,— এটাকেই সে মনে করেছিল সচেতন বাস্তববোধ। দুঃখের দিন সুরু হবার পর এটাকেই সে ধরে নিয়েছিল পরম আশীর্ব্বাদ বলে।

ভেবেছিল, যেমন বিপাকেই পড়ুক আর যত মারাত্মক হোক অবস্থা, শেষ পর্য্যন্ত দুর্দ্দিন সে পার হয়ে যাবে। সাধনা আরও শোচনীয় করে তুলবে না অবস্থা, পদে পদে ব্যাহত করবে না তার লড়াই, সবটুকু জীবনীশক্তি সে কাজে লাগাতে পারবে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাতে।

বরং নানাভাবে তাকে সাহায্যই করবে সাধনা। শুধু সেবা করে ভালবেসে নয়, সব কষ্ট আর জ্বালা লুকিয়ে সব সময় হাসিমুখ দেখিয়ে নয়—ওসব অতটা দরকারী মনে করে নি রাখাল। বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সাধনা বাস্তব অবস্থা বুঝে তার সঙ্গে চলতে পারবে—এটাই ছিল তার সব চেয়ে বড় ভরসা।

কদিন ধরে ভাঙতে ভাঙতে আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সে ভরসা। সে রকম বাস্তব বুদ্ধিই নেই সাধনার, সে করবে স্রোতে গা ভাসিয়ে ধ্বংসের দিকে চলার বদলে অবস্থাকে নিজের আয়ত্তে রেখে বাঁচার চেষ্টায় তাকে সাহায্য!

একটা গোড়ার হিসাবেই তার ভুল হয়ে গেছে। বড় মারাত্মক ভুল।

গোড়া থেকে খেয়াল রাখলে ধৈর্য্য আর সংযমের সীমা পার হয়ে সাধনাকে সে নতুন এক বিপদ হয়ে উঠতে দিত না, অন্যভাবে সামলে চলতে পারত এদিকটা। গোড়া থেকে জানা থাকলে আজ সাধনার উপর সব আস্থা হারিয়ে নিজেকে এত বেশী নিরুপায় অসহায় মনে হত না।

দিনের পর দিন কি শক্তিটাই তাকে ক্ষয় করে আসতে হয়েছে দেহ আর মনের। প্রথম থেকে না জেনে আজ এই অসময়ে জানা গেল সাধনা তার সাথী নয়, বোঝা।

চায়ের কাপ সামনে রেখে রাখাল ভাবে। নতুন করে আবার হিসাব মেলাবার চেষ্টা করে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কোন লাভ নেই, তার চেয়ে এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে চায়ের দোকানে আধঘণ্টা বসা ভাল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা রাখাল জেনেছে।

দেয়ালে গত বছরের ক্যালেণ্ডারের একটা ছবি ঝুলানো। অতি সুন্দর ছবি বলে ক্যালেণ্ডার শেষ হয়ে গেলেও ছবিটা

টাঙ্গানো আছে। বড়ই জনপ্রিয় হয়েছে ছবিটি। বনবাসিনী স্বামীসোহাগিনী সীতা ধনুকধারী সন্ন্যাসী রামের অঙ্গলগ্না হয়ে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে অদূরে সোনার হরিণকে। ছবির দিকে তাকানো মাত্র বোঝা যায় সীতার কি আবদার—জগৎ সংসার চুলোয় যাক, সোনার হরিণ তার চাই!

রাজার মেয়ে আর রাজার যে ছেলে রাজা হবে তার বৌ: কত সোনার কত গয়নাই না জানি সীতার ছিল! সব গয়না ফেলে, গায়ের গয়নাগুলি পর্য্যন্ত খুলে রেখে বনে যেতে মায়া হয় নি সীতার। কিন্তু বনের মধ্যে সোণার হরিণ দেখেই মেয়েদের চিরন্তন সোণার লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার অবুঝ আবদারের কাছে হার মানতে হয়েছে রামের।

গয়ণা ফেলে আসতে মায়া হয় নি, সে কি এইজন্য যে চোদ্দ বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে? চোদ্দ বছর পরে রাম আবার রাজা হলে ওই রেখে যাওয়া সোনার গয়নার সঙ্গে আরও কত গয়না যোগ হবে সীতার!

নয় তো নতুন প্যাটার্ণের নতুন একটা গয়নার মত সোনার একটা হরিণ দেখে এমন মোহ কি জাগতে পারে সীতার, গায়ের গয়নাগুলি পর্য্যন্ত যার তুচ্ছ করে ফেলে আসতে একবার ভাবতে হয় নি?

চা জুড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে মাথাটা বেঞ্চের উপর নেমে আসে রাখালের। চায়ের জন্য পয়সা দিতে হবে। চায়ের কাপে একটা চুমুক না দিয়েই বেচারী গভীর ঘুমের কবলে গিয়ে পড়েছে।

তাকে যে চা দিয়েছিল সেই ছোকরাই একটু ইতস্ততঃ করে আস্তে ডাকে, বাবু—

দোকানের মালিক গিরীন সামনে ছোট্ট টেবিলটিতে ক্যাশ বাক্স রেখে নিজের সাতবছরের পুরানো মোটা কাঠের টুলে বসে চারিদিকে শ্যেন দৃষ্টি পেতে রাখে। সে চাপা গলায় ধমকে ওঠে, এই চোপ, ডাকিসনে। খবর্দ্দার বলে দিলাম।

ঘণ্টু কাছে সরে এসে বলে, মোটে এক কাপ চা নিয়েছে—

ঃ হল বা এক কাপ চা, নিয়েছে তো!

ঘণ্টু চোখ বুজে একটা অদ্ভুত মেয়েলি ভঙ্গি করে। ছেলেটার মেটে মেটে ফর্সা রঙ, মুখে বসন্তের দাগ, গোলগাল চেহারা। ঘণ্টার চালচলনে খানিকটা মেয়েলি ভাব আছে, বৌ-বৌ ভাব! গলায় তার একটি সোনার চেন হার।

গিরীন বলে, আরে শালা, খদ্দের হল খদ্দের। খাতির পেলে আরাম পেলে তবে তো একদিনের খদ্দের দশদিন আসবে। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক না বাবু, ঘুম ভেঙ্গে খুসী হবে। ভাববে যে না, এ দোকানটা ভাল।

বলে গিরীন ঘণ্টুর গালটা টিপে দেয়।

বেঞ্চ থেকে যখন সে মাথা তোলে বেলা পড়ে এসেছে।

ঘণ্টু বলে, রাতে ঘুমোননি বাবু?

রাখাল নীরবে চায়ের দামটা তার হাতে দেয়। অপরাধীর

মতই তাড়াতাড়ি চায়ের দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এক কাপ চায়ের দাম দিয়ে এতক্ষণ দোকানে আশ্রয় নিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ার মত নিরাপদ আশ্রয়!

পথে অসংখ্য মানুষ। দোকানে লোক কম, কাপড়ের দোকানেও—যত ভিড় গিয়ে যেন জমেছে রেশনের কাপড়ের দোকানে। সাধনাকে এমাসে একখানা কাপড় দিতেই হবে। আগেকার ক'খানা ভাল কাপড় ছিল বলে এ পর্য্যন্ত কোন মতে চলেছে, আর চালানো অসম্ভব। সেলাই করে চালিয়ে দেবারও একটা সীমা আছে, যার পরে আর চলে না, নিজে থেকে কাপড় ফেঁসে যায়।

তার নিজের? তাকে তো বেরোতে হবে টুইসনি করতে, চাকরী খুঁজতে। তার নিজেরও একেবারে অচল অবস্থা। কি দিয়ে কি ভাবে কি করবে ভেবেও কূল পাওয়া যায় না।

কিন্তু সাধনা এদিকে যাবেই তার ভাগ্নীর বিয়েতে, নতুন হার গলায় পরে যাবে! নিজের কানপাশা রেবাকে উপহার দিয়ে সম্মান বজায় রাখবে।

তীব্র জ্বালাভরা হাসি ফোটে রাখালের মুখে।

প্রভাকে পড়াতে যেতে আরও প্রায় দু'ঘণ্টা দেরী। রাস্তায় রাস্তায় কাটাতে হবে এ সময়টা। আরও একটা টুইসনিও যদি জোটাতে পারত!

পথেই সময় কাটায়। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় ছোট পার্কটার বেঞ্চে বসবার যায়গার খোঁজে—বেঞ্চ খালি নেই। মানুষ বেড়াতে বেরিয়ে বেঞ্চ কটা দখল করে নি। যারা

বসেছে তারই মত তাদেরও দরকার হয়েছে কোথাও একটু বসবার। এটা বোঝা যায়।

এক বাড়ীর রোয়াকে বসতে পায়। তাও নির্ব্বিবাদে নয়!

ঃ কি চান?

ঃ কিছু না। একটু বসছি।

জানালায় উঁকি দেওয়া প্রৌঢ় মুখটি খানিকক্ষণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আড়ালে সরে যায়।

কয়েক হাত তফাতে ফুটপাতে ঘোমটা টেনে একটি বৌ বসে আছে। তার সামনে বিছানো ন্যাকড়ায় পড়ে আছে একটি ঘুমন্ত কঙ্কাল শিশু। বৌটির সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, সেলাই করা শত জীর্ণ ময়লা কাপড়েই ঢাকা, শুধু ডান হাতটি বার করে পেতে রেখেছে নিঃশব্দ প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তার সামনে পথ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি মিছিল পার হয়ে যায়। তিনটিই চলেছে একদিকে। মেয়েপুরুষ ছেলেমেয়ের দুটি মিছিল, একটি মজুরের। উদ্বাস্তুদের মিছিল, ছাত্রছাত্রীর মিছিল, ধর্মঘটী মজুরের মিছিল। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা দাবীগুলি উঁচু করে তুলে ধরে একসঙ্গে মুখে দাবী ঘোষণা করতে করতে চলেছে মিছিলগুলি। রাখাল ভাবে, প্ল্যাকার্ডে লিখে আর মুখে ধ্বনি তুলে ঘোষণার বোধ হয় দরকার হয় না আর। সব মানুষের আজ কিসের অভাব আর কি কি চেয়ে মানুষ মিছিল করে কারো কি অজানা আছে!

ঘোমটা তুলে দিয়ে তিনবারই বৌটি যতক্ষণ দেখা যায়

মিছিল ছাখে, তারপর আবার ঘোমটা টেনে ডান হাতটি তেমনিভাবে একটু বাড়িয়ে ধরে বসে থাকে। মুখ দেখে বোঝা যায় বয়স তার সাধনার চেয়েও কম হবে।

এই বৌটিকে যদি সাধনা একবার দেখত!

কিন্তু সত্যই কিছু লাভ হত কি দেখে? এই বৌটিকেই না দেখুক, এরই মত অভাগিনী বৌ তো আজ পথেঘাটে ছড়িয়ে আছে দেশের, তাদের দু'চার জনকে কি আর ছাখে নি সাধনা?

সাধনা কি জানে না দেশের বেশীর ভাগ লোকের আজ কি অবস্থা এবং সেজন্য নিজেরা কেউ তারা দায়ী নয়?

কিন্তু দেখেও সাধনা দেখবে না, জেনেও সে জানবে না। তাকেই সে দায়ী করে রাখবে সব দুর্ভাগ্যের জন্য! সে বুঝবে না যে ঘরের চাপে বাইরের চাপে রাখাল যদি পঙ্গু হয়ে যায় তারপর হয় তো তারও একদিন এই বৌটির দশাই হবে।

প্রভা বলে, জ্বর নিয়ে পড়াতে এলেন নাকি?

ঃ জ্বরের মত হয়েছে একটু।

ঃ তবে এলেন কেন?

রাখাল মনে মনে বলে, এলাম কেন? না এলে তোমরা যে রাগ করবে!

মুখে বলে, খানিকক্ষণ পড়িয়ে যাই। একেবারে ফাঁকি দিলে চলবে কেন?

প্রভা মুখ ভার করে বলে, ভাগ্যে আমি আপনাকে

মাইনে দিই না—টাকাটা বাবার। নইলে সত্যি একবার চটতে হত। মুখের ওপর এমন করে কাউকে ধিক্কার দিতে আছে ?

: ধিক্কার কিসের ?

প্রভা একটু হেসে বলে, আমরা জন্ম জন্ম দাসীর জাত, মেয়েমানুষ। ধিক্কার দেবার এ কৌশল আমরা জানি। জ্বর গায়ে রাঁধতে গিয়ে আমরা যখন বলি, না রেঁধে উপায় কি, সবাই খাবে কি—তখন সেটা পুরুষদের ধিক্কার দিয়েই বলি।

: তোমাকে রাঁধতে হয় নাকি ?

বলেই রাখাল গুম খেয়ে যায়। আগের বার ধিক্কার না দিয়ে থাকলেও এ কথাটা রীতিমত খোঁচা দেওয়া হয়ে গেছে। বড়লোকের মেয়েকে এ প্রশ্ন করার একটাই মানে হয়।

মুখখানা সত্যই ম্লান হয়ে যায় প্রভার। এত উজ্জ্বল তার গায়ের রঙ যে মুখে একটু মেঘ ঘনালেই মনে হয় দুর্যোগ ঘনিয়েছে।

রাখাল আবার বলে, কিছু মনে করো না প্রভা।

প্রভা বলে, কেন মনে করব না ? আমার বাবা কি খুব বেশী বড় লোক ? বার শো টাকা মাইনে পান। আজকের দিনে বার শো টাকা পেলে কেউ বড়লোক হয় ? টাকার ভাবনায় রাত্রে বাবার ঘুম হয় না তা জানেন ?

রাখাল বিব্রত হয়ে বলে, আমি এমনি বলেছি কথাটা। একটা রাঁধুনি তো আছে, তোমরা না রাঁধলেও চলে, এর বেশী কিছুই বলতে চাইনি।

প্রভা কিন্তু এত সহজে তাকে রেহাই দিতে রাজী নয়। সে ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে, তা না চাইলেও এটা সত্যি যে আমাদের সম্পর্কে আপনাদের অনেক ভুল ধারণা আছে। রাঁধতে হয় না বলেই কি আমি স্বাধীন? যাদের রাঁধতে হয়, আমিও তাদেরি দলের। খানিকটা আরামে থাকি, এইটুকু তফাৎ।

রাখাল আর কথা কয় না। এবার কিছু বলা মানেই ছাত্রীর সঙ্গে তর্কে নামা। প্রভা নতুন থিয়োরি শিখেছে, সবটাই অতি রোমাঞ্চকর। তফাৎ থাকলেও যে রাঁধুনী রাখে পয়সা দিয়ে সে সমান হয়ে গিয়েছে দুবেলা যাকে পয়সার জন্য পরের বাড়ী হাঁড়ি ঠেলতে হয় তার সঙ্গে—এই অতি মনোরম সিদ্ধান্ত সে আবিষ্কার করেছে একেবারে অন্য স্তরের অন্য এক সত্য থেকে। বড় ধনী ছাড়া বড় ধনিকের শাসনে সবাই এদেশে নিপীড়িত। দুর্মূল্য খোলা বাজার আর চোরা-বাজার শুধু তার বাবার মত বার শ' টাকা আয়ের মানুষকে কেন আয় যাদের আরও অনেক বেশী তাদেরও জোরে আঘাত করেছে—মাঝারি ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত আজ বেসামাল হবার উপক্রম। ধনিক শাসনের অবসান শুধু গরীবের নয়, এদেরও স্বার্থ।

এ পর্য্যন্ত অবশ্যই সত্য কথাটা। কিন্তু এই সূত্র ধরেই প্রভা যখন তাদের সঙ্গে সাধনাদের তফাৎটা, অগ্নিমূল্যেও যারা আরাম বিলাস কিনতে পারে তাদের সঙ্গে যাদের স্রেফ ভাত কাপড়ের টানাটানি তাদের তফাৎটা নিছক

আরামে থাকা না থাকায় দাঁড় করায় তখন গা জ্বালা করারই কথা।

আরামের অভাব আর আসল অভাব প্রভার কাছে এক!

প্রভা টেবিলের বইগুলি ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে, এ পড়া আজ পড়ব না। চুপ করে গেলেন কেন জানি। ভুল কথা কি বললাম আজ তাই পড়ান আমাকে। বেশ, আপনার কথাই ঠিক—

ঃ আমি তো কিছুই বলি নি!

চুপ করে থাকা মানেই বলেছেন। আপনি ভাবছেন, গরীবের মেয়ের সঙ্গে আমার তুলনা! তারা ভাল করে খেতে পরতে পায় না আর আমি দামী শাড়ী পরি, মাছ দুধ খেয়ে মোটা হই!

প্রভার গড়ন সত্যই একটু মোটাসোটা ধরণের। তাই নিজের কথায় নিজেই সে একটু মুচকে হাসে।

ঃ কিন্তু ভাল খেতে পরতে পাই বলেই কি আমি পুরুষের অধীন নই, পুরুষের সম্পত্তি নই? আমার বেলা ভিন্ন নিয়ম? গরীব ঘরের মেয়েদের বেলা স্পষ্ট চোখে পড়ে, আমাদের বেলা আড়ালে থাকে এইমাত্র।

এবার তার মনের গতি ধরতে পেরে রাখাল হেসে বলে, তুমি ঠিক উল্টোটা বলছ। ওটা বরং গরীবের ঘরেই খানিক আড়াল থাকে। মেয়েরা যে পুরুষের সম্পত্তি বড় লোকের ঘরেই এটা সব দিক থেকে চোখে পড়ে। সাজিয়ে গুজিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে আদরে আহ্লাদে যে রাখে, তার মানেই তো

তাই। নিজের সম্পত্তি তাই এত আদর এত যত্ন। গরীবের ঘরেই হঠাৎ ধরা যায় না। মেয়েরা যেরকম খাটে আর কষ্ট করে তাতে মনে করা চলে তারা কারো সম্পত্তিই নয়, বেওয়ারিস জিনিষ। নিজের সম্পত্তিকে কেউ এত খারাপ ভাবে রাখে ?

প্রভা দমে গিয়ে বলে, তাইতো! এটা তো ভাবি নি ? আমি ভাবতাম মালিক মানেই যে কষ্ট দেয়, অত্যাচার করে!

ঃ যেমন মিলের মালিক ?—রাখাল হাসে, মালিক কি মিলের ওপর অত্যাচার করে ? মিলটার জন্য তার যত দরদ! অত্যাচার করে মিলে যারা খাটে তাদের ওপর—কত কম পয়সায় যত খাটুনি আদায় করতে পারে।

রাখালের চা আর খাবার আসে। ভাল দামী খাবার, ডিমের মামলেট।

ঃ জ্বরের ওপর খাবেন ?

রাখাল খেতে আরম্ভ করে বলে, জ্বর নয়, জ্বর ভাব। খেতে না পেলেই সেটা হয়।

প্রভা নীরবে তার খাওয়া ছাখে। মনের মধ্যে তার পাক দিয়ে বেড়ায় একটা প্রশ্ন—বেকার জীবনের দারিদ্র্য কি পরিবর্ত্তন এনেছে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের ? যদি এনে থাকে, সে পরিবর্ত্তনের মর্ম্মকথা কি ? সে জানে যে দারিদ্র্য রসকস্ শুষে নেয় জীবনের, জ্বালা আর অশান্তি রুক্ষতা এনে দেয় মাধুর্য্য কোমলতার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে। কিন্তু ঠিক কিরকম হয় তার ভিতরের রূপটা ?

পরস্পরের সম্পর্কে মিষ্টতার অভাব ঘটে, কারণে অকারণে তিক্ততার সৃষ্টি হয়—কিন্তু এসব সত্ত্বেও পরস্পরকে গ্রহণ তো তাদের করতে হয়। মানিয়ে চলতে হয় দুজনকে, মেনে নিতে হয় পরস্পরকে। কেমন হয় তাদের এই আত্মীয়তা? সব কিছু সত্ত্বেও আপন হওয়া?

নিস্তরঙ্গ ভোঁতা হয়ে যায়? যান্ত্রিক হয়ে যায়? বাস্তব বাঁধনে বাঁধা নিরুপায় দু'টি নরনারীর স্থূল সম্পর্ক দাঁড়ায়?

অথবা দুঃখকষ্ট হতাশার প্রতিক্রিয়ায়, সংঘর্ষের জ্বালায় স্থূল বাস্তব আত্মীয়তাটুকু হয় উগ্র, অস্বাভাবিক, রোমাঞ্চকর?

কথাটা এমন জানতে ইচ্ছা করে প্রভার।

কিন্তু একথা তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না রাখালকে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে বোধ হয় জানাও যায় না এসব কথা।

অন্য আরেকটা প্রশ্ন ছিল প্রভার। যে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সে প্রস্তুত করছে তারই সম্পর্কে।

ভেবেচিন্তে এ বিষয়েই সে প্রশ্ন করে। বলে, আচ্ছা, স্বাধীনভাবে যে মেয়েরা রোজগার করে তারা কি সত্যিকারের স্বাধীন?

এ প্রশ্নের মানে রাখাল জানত। এটা প্রভার ব্যক্তিগত প্রশ্নও বটে।

ঃ স্বাধীনভাবে রোজগার করে? কোন দেশের মেয়ের কথা বলছ? এদেশে পুরুষেরা স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পায় না, মেয়েরা কোথা থেকে সে সুযোগ পাবে? রোজগার

করে এই পর্য্যন্ত। এ ধারণাই বা তুমি কোথায় পেলে নিজে রোজগার করলেই মানুষ স্বাধীন হয়? পুরুষরা অন্ততঃ তাহলে স্বাধীন হয়ে যেত! সত্যিকারের স্বাধীনতা অনেক বড় জিনিষ।

ঃ মেয়েদের চাকরীবাকরী করার তা হলে কোন মানে নেই?

ঃ মানে আছে বৈকি! মস্ত মানে আছে। এদেশে বেশ কিছু মেয়ে ঘরের কোণ ছেড়ে রোজগার করতে বেরিয়েছে, এ একটা কত বড় পরিবর্ত্তনের লক্ষণ আমাদের চেতনার। এটা কি সোজা কথা হল? সব চেয়ে বড় কথা কি জানো? যারা রোজগার করতে ঘর ছেড়ে বেরোয় নি তারাও এটা মেনে নিয়েছে। মেয়েমানুষ আপিস করে শুনে ঘরের কোণার ঘোমটা-টানা বৌও চোখ বড় বড় করে গালে হাত দেয় না। সেকেলে গোঁড়া পুরুষ এটা পছন্দ না করলেও সায় দিয়েছে— আমার ঘরে ওসব চলবে না, তবে সমাজে চলছে, চলুক। পুরুষের অ্যাপ্রুভড্ উপায়ে মেয়েরা রোজগার করুক এটা চালু হয়ে গেছে সমাজে—কিছু মেয়ের চাকরী করার চেয়ে এটাই বড় কথা।

ঃ পুরুষের অ্যাপ্রুভড্ উপায়ে?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে রাখাল স্থির দৃষ্টিতে প্রভার মুখের দিকে চেয়ে বলে, তাছাড়া কি উপায় আছে? সামাজিক অনুমোদন মানেই পুরুষের অনুমোদন। এটা হল চাকরী-বাকরীর বেলায়। অন্যভাবেও মেয়েরা রোজগার করে—সমাজ সে নোংরা উপায়টাতে সায় দেয় না,

সয়ে যায়। কিন্তু ওসব কারবারও পুরুষরাই চালায়, তারাই কর্ত্তা।

প্রভা কাতরভাবে বলে, এতকাল নারী আন্দোলন করে আমরা তবে করলাম কি?

রাখাল আশ্বাস দিয়ে বলে, অনেক কিছু করেছো। সারা দেশের মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছো। মেয়েপুরুষের আসল স্বাধীনতার লড়াইকে জোরালো করেছো। তবে শুধু মেয়েদের জন্য মেয়েদেরই পৃথক নিজস্ব নারী আন্দোলন তো নিছক সস্তা সখের ব্যাপার—মেয়েরাও প্রাণের জ্বালায় যাতে আসল বড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে না বসে সেজন্য তাদের স্বার্থ ভিন্ন করে নিয়ে একটা বেশ ঝাল ঝাল টক টক মিষ্টিমধুর আন্দোলনে তাদের মাতিয়ে দেওয়া। পুরুষেরা মেয়েদের দাসী করে রেখেছে, এই বলে মেয়েদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করার মানেই হচ্ছে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের মত পুরুষ-রাষ্ট্র নারী-রাষ্ট্র চাওয়া।

রাখাল একটা সিগারেট ধরায়। এই একটা সিগারেটই তার সম্বল ছিল।

বলে, পুরুষের বিরুদ্ধে মেয়েদের কোন লড়াই নেই। সব লড়াই অবস্থা আর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কোন দেশে যদি একজন বেকার থাকে, সে দেশে একটি মেয়ের সাধ্য নেই স্বাধীন হয়। সকলের ভাতকাপড় পাওয়া আর মেয়েদের স্বাধীন হওয়া,—হলে দুটোই একসাথে হবে নইলে কোনটাই হবে না।

প্রভা সংশয়ের সঙ্গে বলে, আপনি ধাঁধাঁয় ফেললেন। মেয়েরা এরকম পদানত হয়েই থাকবে, তার মানে আন্দোলন করবে শুধু পুরুষেরা ?

রাখাল খুসী হয়ে বলে, ভাগ্যে আজ পড়তে না চেয়ে তর্ক জুড়েছ প্রভা। নইলে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত তোমার সম্পর্কে, ভাবতাম তুমি বুঝি শুধু বই মুখস্ত আর পরীক্ষা পাশ কর

প্রভা খুসী হয়ে মাথা নত করে টেবিলে আঙ্গুল দিয়ে লা ইন টানে।

রাখাল বলে, কিন্তু এত মেয়ে লড়াই করছে, গুলির সামনে পর্য্যন্ত বুক পেতে দিচ্ছে, তবু তোমার এ ধাঁধাঁ কেন ?

ঃ সে তো শুধু কিছু অগ্রণী মেয়ে।

অগ্রণী হয় কারা ? যারা পিছিয়ে আছে তাদের যারা এমনভাবে ছাড়িয়ে গেছে যে কোন মিল নেই, সম্পর্ক নেই ? একজনও যখন এগিয়ে যায় তখন বুঝতে হবে পিছিয়ে থাকলেও দশজনের মধ্যে সাড়া এসেছে, সমর্থন এসেছে—সে তারই প্রতীক। নইলে সে কি নিয়ে কিসের জোরে এগোল ? পুরুষেরা এগিয়ে গেলে মেয়েরাও এগিয়ে যাবে। মেয়েদের দমিয়ে রেখে বাদ দিয়ে কি পুরুষের লড়াই চলে ?

প্রভা তবু ছাড়বে না। মৃদু হেসে বলে, লড়াই পুরুষের, তবে মেয়েদেরও দরকার বলে দয়া করে সঙ্গে নেয়। আমিও এই কথাই বলছিলাম।

রাখালের মুখেও হাসি ফোটে।—দয়া মায়া সমাজ শ্রেণী মেয়ে পুরুষ সব জড়িয়ে দিচ্ছ কিনা, তাই এই ধাঁধাঁও কাটছে না। দয়া? দয়া আবার কিসের? অবস্থা পাল্টে দিতে যে পুরুষ লড়াই করছে, অবস্থাটা কি আর কেন না জেনেই কি সে লড়াই করছে? মেয়ে পুরুষের বর্ত্তমান সম্পর্কটাও যে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার আরেকটা অভিশাপ,—পুরুষের পক্ষেও অভিশাপ, সে তা জানে। এ অভিশাপ দূর করাও তার কাজ।

একটু থেমে রাখাল আবার বলে, স্বাধীনতার লড়াইয়ের চেতনা যে স্তরেই থাক, এ চেতনাটাও থাকে। না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না—কবে লেখা হয়েছিল মনে আছে?

প্রভা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কোন একটা প্রশ্ন করবে কি করবে না ভেবে সে ইতস্ততঃ করছে বুঝে রাখালও চুপ করে অপেক্ষা করে।

ঃ একটা কথা বললে রাগ করবেন?

ঃ কথাটা না শুনে কি করে বলি?

ঃ যে কথাই হোক, আগে বলুন রাগ হলেও রাগ করবেন না। একটিবার নয় রাগ না করার চুক্তিতে একটা কথা আমায় বলতেই দিলেন!

ঃ বেশ তাই হবে, বলো।

প্রভা গম্ভীর হয়ে মুখের ভাবে গুরুত্ব আনে। জোর করে সোজা তাকিয়ে থাকে রাখালের চোখের দিকে।

ঃ আপনি এত বোঝেন। সাধনাদি কেন ঘর ছেড়ে বেরোন না? শুধু সংসারটুকু নিয়ে থাকেন?

এরকম প্রশ্ন রাখাল কল্পনাও করে নি। মেয়ে পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সাধারণ আলোচনা থেকে প্রভা একেবারে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসবে এটা ভাবা সত্যই সম্ভব ছিল না তার পক্ষে! রাগ হয় প্রচণ্ড, মুখ তার লাল হয়ে যায়। দেখে মুখখানা ম্লান হয়ে আসে প্রভার।

রাগটা সামলে যায় রাখাল। রাগ করবে না কথা দিয়েছে বলেই শুধু নয়, প্রভা যে তাকে খোঁচা দিতে বা অপমান করতে কথাটা জিজ্ঞাসা করেনি এটা খেয়াল করে। মনের মধ্যে এ ধাঁধাঁটাও পাক খাচ্ছিল তার। সরলভাবে তাকেই জিজ্ঞাসা করে বসেছে এর সমাধান কি।

ঃ সাধনাদিকেই জিজ্ঞাসা করলে পারতে প্রভা।

ঃ তিনি তো বুঝিয়ে দিতে পারবেন না।

ঃ তুমি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলে। তোমার সাধনাদি বুঝিয়ে দিতে পারবে না সে কেন ঘরের কোণায় দিন কাটায়। তার মানেই সে এসব বোঝে না।

ঃ আপনি বুঝিয়ে দেন না?

রাখাল ম্লান হেসে বলে, বুঝবে কেন? এসব বুঝিয়ে দেবার চুক্তিতে তো তাকে বিয়ে করি নি!

এটা রাগের কথা রাখালের।

বাড়ী ফেরার পথে রাখালেরও মনে হয়, তার কথায় মস্ত একটা ফাঁকি আছে।

সত্যই সে কি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে সাধনাকে যে তাকে আর তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আর তার একার নেই? এজন্য নেই যে এটা তার অসাধ্য হয়ে গেছে, এমনি আজ দুরবস্থা দেশের?

না, আন্তরিকভাবে বাস্তব উপায়ে এ চেষ্টা সে কোনদিন করেনি।

কথাই শুধু বলেছে নানারকম। দেশ বিদেশের কথা শুনিয়েছে সাধনাকে, দেশের আজ কেন এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা সেটা ব্যাখ্যা করেছে অনেকটা নিজের বেকারত্বের সাফাই হিসাবে। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে নিজের দোষে সে বেকার নয়, সাধনা যে কষ্ট পাচ্ছে সেটা তার অপরাধ নয়, দেশের মানুষ যাদের বিশ্বাস করেছিল, যারা সত্যিকারের মুক্তি এনে দেবে ভেবেছিল, এটা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল।

বেঁচে থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সে ভাগাভাগি করতে চায়নি সাধনার সঙ্গে। যেভাবে পারে একা সে ভরণ-পোষণ করবে তাকে আর তার আগামী সন্তানদের, নীড় বেঁধে দিয়ে রক্ষা করবে সেই নীড়, বিয়ের এই চুক্তিটা নিজেই সে পালন করতে চেয়েছে প্রাণপণে। অক্ষমতার জন্য তাই অবস্থার অজুহাত দিয়ে, নিজের নির্দোষিতার কৈফিয়ৎ দিয়ে শুধু মান বাঁচাতে চেয়েছে সাধনার কাছে।

আসলে আজও তার মন মজে রয়েছে আগের দিনের

ফুরিয়ে আসা জীবন ধারার রসে। চাকরী করে ছুটো পয়সা এনে ছোট একটা ঘর বেঁধে সীমাবদ্ধ জীবনের ছোটখাট সুখ-দুঃখ নিয়ে দিন কাটাবার অভ্যাস আজও নেশার মত তাকে টেনেছে, আজও সে জের টেনে চলতে চায় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সেই অভ্যাসের।

জানে যে জগৎ পাল্টে যাচ্ছে, তাদের ঘর-সংসার ভেঙ্গে পড়ছে সেই পরিবর্ত্তনের অঙ্গ হিসাবে, শেষ হয়ে আসছে তাদের মত মানুষের পুরাণো ধাঁচের জীবন যাত্রা। আর ফিরে আসবে না তাদের আগেকার জীবন।

তবু, জেনেও এখনো সে আঁকড়ে থাকতে চায় সেই জীবনকেই, যেটুকু আজও বজায় রাখা যায় সেইটুকু দিয়েই আজও মন ভুলাতে চায় নিজের যে এখনো টিকে আছি, টিঁকিয়ে রেখেছি পারিবারিক জীবন।

নিজে একা একটু অংশ নিয়েছে সকলের দুরবস্থার প্রতিকারের চেষ্টায়, নতুন করে সব গড়ার লড়ায়ে। এটুকু করেই সন্তুষ্ট থেকেছে।

•

বাসে উঠে দেখা হল বেলার স্বামী ধীরেনের সঙ্গে।

বেলা সাধনার ছেলেবেলার বন্ধু। সেই সূত্রে রাখাল ও ধীরেনের পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হলেও দু'জনের সম্পর্ক বন্ধুত্বের পর্য্যায়ে উঠতে পারে নি।

বোঝাই বাসে কথা হয় না। প্রভা আজ না পড়ায় রাখাল সকাল সকাল ছুটি পেয়েছে, বাসে এখন যাত্রীদের

গাদাগাদি। পুরো টাইম পড়িয়ে রাখাল যেদিন বাসে ওঠে সেদিনও অবশ্য কিছুটা পথ তাকে দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।

সহরতলীর কাছাকাছি গিয়ে ধীরেনের পাশেই সে বসতে পায়।

বলে, খবর কি?

ঃ সেই এক খবর।

ঃ কিছু হল না?

ঃ কি করে হয়! রামরাজ্যে কিছু হয় না।

চাকরী দানের সরকারী আপিস সম্পর্কে ধীরেন তার নতুন অভিজ্ঞতার কাহিনী আরম্ভ করে, কাহিনী শেষ না হতেই বাস দাঁড়ায় তার নামবার ষ্টপেজে। সে বলে, নামুন না? খানিক বসে গল্প করে যাবেন?

এখান থেকে রাখালের বাড়ীও মোটে কয়েক মিনিটের পথ। সে ধীরেনের সঙ্গে নেমে যায়।

সরু গলির মধ্যে চারকোণা উঠানের চারদিকে ঘর তোলা সেকেলে ধরণের পুরাণো একটি দোতলা বাড়ীতে ধীরেনের আস্তানা—একতলায় একখানি ঘর, আলো বাতাস খেলে না। সমস্ত বাড়ীটাতে এমনিভাবে একখানা দু'খানা ঘর নিয়ে মোট ন'ঘর ভাড়াটে বাস করে। সকালে বিকালে ন'টি ছোট বড় পরিবারের উনানে যখন প্রায় একসঙ্গে আঁচ পড়ে, অনেককে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয় রাস্তায়।

বেলা বলে, আসুন।

সে হাত কল চালিয়ে ফ্রক সেলাই করছিল। তার নিজের

মেয়েটির বয়স মোটে ছ'বছর, ফ্রকটা দশ এগার বছরের মেয়ের। আরও ছ'তিনটি সেলাই করা সায়া ব্লাউজ পাশে পড়ে আছে, কিছু আলগা ছিটের কাপড়ও আছে।

ঃ এত কি সেলাই করছেন ?

বেলা শুধু একটু হাসে।

জামা কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরতে পরতে ধীরেন গম্ভীর শুকনো গলায় বলে, পাড়ার লোকের ফরমাস সব। উনি বাড়ীতে দর্জির দোকান খুলেছেন।

বলে সে গামছাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

বেলা বলে, গয়না বেচে খাচ্ছি। বিয়েতে কলটা পেয়েছিলাম, সখের জিনিষ ঘর সাজিয়ে রেখে লাভ কি ? এমনি কত জামা সেলাই করে দিয়েছি কতজনকে, আজ দরকারের সময় ছুটো পয়সা যদি রোজগার হয়, দোষের কি আছে বলুন ?

ঃ কে বলে দোষ ?

ঃ উনি খুঁত খুঁত করেন। পাড়ার চেনা লোকের কাছে পয়সা নিয়ে জামা সেলাই করব, ওনার সেটা পছন্দ হয় না।

ঃ পছন্দ না হয়ে উপায় কি ?

ঃ উপায় নেই। তবু পছন্দ হয় না।

রাখাল ভাবে, সাধনার কল নেই। কিন্তু কল থাকলেও সে কি নিজে উদ্যোগী হয়ে এভাবে কিছু রোজগারের উপায় খুঁজে নিতে পারত ? এদিকটা খেয়াল হত না সাধনার, সে হয়তো বলতো যে নগদ যা পাওয়া যায় তাতেই কলটা বেচে দাও, সেই টাকায় কিছুদিন চলুক।

৬

কি দোলটাই যে খায় সাধনার মন।

এক সিদ্ধান্ত থেকে একেবারে বিপরীত আরেক সিদ্ধান্তে!

বাসন্তী একরাশ নোট দিয়েছে তাকে—কারণ, হারের দামটা সে যা দিয়েছে তার মধ্যে দু'চারখানা পাঁচ টাকার ছাড়া বাকী সব দু'টাকা একটাকার নোট।

সংসারের খরচ থেকে একটি দু'টি করে বাসন্তী টাকাগুলি জমিয়েছে।

বাসন্তী নিজে এসে গুণে দিয়ে গিয়েছিল নোটগুলি। সাধনা আরেকবার গুণে বাক্সে তুলে রেখেছিল—ট্রাঙ্কের মধ্যে তার গয়না রাখার ছোট বাক্সে। বাক্সে যেন আঁটে না এত নোট!

ক'ভরি সোনার বদলে একরাশি টুকরা কাগজ।

প্রথমে তার মনে জেগেছিল একটা দ্বিধা। রাখালের ভরসা না করে কাল আবার বাসন্তীর সঙ্গে দোকানে গিয়ে নিজেই কিনে আনবে নতুন হারটা? অথবা রাখালকে টাকা দেবে কিনে আনতে?

রাখালকে জানানো হয় নি সে নিজেই হার বিক্রীর ব্যবস্থা করেছে!

হার কেনার ব্যবস্থাটাও যদি রাখালকে না জানিয়ে করে?

যে ব্যবহারটা রাখাল জুড়েছে তার সঙ্গে তার একটা উচিতমত জবাব দেওয়া হবে যে অত সে তুচ্ছ নয়, পরাধীন দাসী নয়!

বাড়াবাড়ি হবে? হোক বাড়াবাড়ি! তাকে নিয়ে রাজীবের মিথ্যা মতলব আন্দাজ করে বাড়াবাড়ির চরম করে নি রাখাল? সে কেন অত সমীহ করে চলবে তাকে?

তবু নানা সংশয় জাগে। একটা অজানা আতঙ্ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় প্রাণটা। জোর করে সে রেবার বিয়েতে যাবে, রাখাল না গেলেও একা যাবে—এই ঝগড়াটাই কোথা থেকে কিসে গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক নেই। রাখাল এখনও তার হুকুম ফিরিয়ে নেয় নি, সেও ছাড়েনি তার জিদ। এত প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তাদের এই বিরোধ যে এবিষয়ে তারপর একটি কথাও হয় নি তাদের মধ্যে!

রাখাল অপেক্ষা করছে সে কি বলে কি করে দেখবার জন্য। হয় তো রাখাল আশাও করছে যে সে তার জিদ ছেড়ে দিয়েছে তাই আর হারের কথা তুলছে না। আর এদিকে সে অপেক্ষা করছে রাখাল নিজে থেকে তার হুকুম ফিরিয়ে নেবে, নতুন হার এনে দেবার জন্য ভাঙ্গা হারটা চেয়ে নেবে, আরেকবার তাকে বিবেচনা করার সুযোগ দেবে যে বিয়েতে সত্যি সে যাবে কিনা।

এ ব্যাপারেই কি ঘটে না ঘটে, আরও গোলমাল সৃষ্টি করা কি ঠিক হবে?

তার ভয় করে। মনে হয় নিজের দোষেই হয় তো সে

নিজের সর্ব্বনাশ করে বসবে। সবদিক দিয়ে দারুণ দুঃসময়, আর কাজ নেই অশান্তি বাড়িয়ে।

এই ভয়টাই আবার যেন তাকে ঘা মেরে কঠিন করে দেয়। এই ভয় যেন তাকে বলে দেয়, তোমার মত নিরুপায় অসহায় কেউ নেই, রাখাল ছাড়া তোমার আর গতি নেই, তোমার সাধ্য নেই রাখালের বিরুদ্ধে যাবার। রাখালের ইচ্ছা অনিচ্ছা খুসী অখুসীই তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা খুসী অখুসী। রাখাল যদি রাখে তবেই তোমার মান থাকে। রাখাল খেতে পরতে না দিলে তুমি খেতে পাবে না, ন্যাংটো হয়ে থাকবে, খেয়াল নেই তোমার ?

আগে খেয়াল ছিল না সত্যই, নিজের জিদ বজায় রাখতে গেলে রাখাল শেষ পর্য্যন্ত কি করবে এই ভয় এবার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়েছে।

একেবারে যেন ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে নিজের সম্পর্কে তার মর্য্যাদাবোধ, এ সংসারে তার অধিকারবোধ মনুষ্যত্ববোধ !

এই তবে তার আসল সম্পর্ক রাখালের সঙ্গে, সংসারের এইখানে তার আসল স্থান ?

ও বাড়ীর সুধা নিয়মিত ভাবে মারধোর লাথি ঝাঁটা পায় স্বামীর কাছে। সুধার সঙ্গে তার আসলে কোন পার্থক্য নেই। রাখাল যে তাকে মারধোর করে না সেটা নিছক রাখালের রুচি। এর মধ্যে তার কোন বাহাদুরী নেই।

তখন আবার বিগড়ে যায় সাধনার মন। এক উগ্র প্রচণ্ড বিদ্রোহ জাগে তার মধ্যে। হোক তার সর্ব্বনাশ, ভেঙ্গে

চুরমার হয়ে যাক তার সংসার, ঘুচে যাক স্বামীর কাছে তার সব আশাভরসা—নত সে হবে না কিছুতেই।

খেতে পরতে দেয় বলে, চিরকালের জন্য তার স্বামীত্বের পদটা দখল করেছে বলে, রাখাল যদি এই জোর খাটিয়ে তাকে দমিয়ে রাখতে চায়—একবার সে চেষ্টা করে দেখুক! দেখুক যে ঠিক মাটি দিয়ে গড়া তার সাধনা নয়, সেও রক্তমাংসের মানুষ, নিজের মান বাঁচাতে সেও শক্ত হতে জানে।

ছেলেকোলে সে রাস্তায় নেমে যাবে। ঝিগিরি রাঁধুনিগিরি করবে। দরকার হলে বেশ্যাবৃত্তি নেবে। তবু—

আবার দোল খেয়ে মন চলে যায় অন্য দিকে। আবার মনে পড়তে থাকে যে রাখাল এ পর্য্যন্ত তাকে অপমান বিশেষ কিছুই করে নি! সেই যে হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতার মত সোজাসুজি তাকে নিষেধ করে দিয়েছিল যে রেবার বিয়েতে তার যাওয়া হবে না, তারপর থেকে একরকম গুম খেয়েই আছে মানুষটা। রাগ করে একজন গুম খেয়ে থাকলে তাতে তার অপমান কিসের?

তাকে ভাই-এর কাছে পাঠাতে চেয়েছে কিছুদিনের জন্য। দুরবস্থায় পড়লে এমন কি কেউ পাঠায় না? এতে তার প্রাণে আঘাত দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মানে ঘা লাগবে কেন?

যেচে চাকরী দিতে চায় বলে রাজীবের মতলব সম্পর্কে যে

ইঙ্গিত সে করেছে, সেটা রাজীবের সম্পর্কেই। রাজীবের মনের মধ্যে কি আছে না আছে সে কথা বলায় তার অপমান কিসের? সে রাজীবকে প্রশ্রয় দেয় এরকম ইঙ্গিত তো রাখাল করে নি।

নিজেই সে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে ব্যাপারটা নিজের মনের মধ্যে। যা শুধু মনোমালিন্য স্বামীস্ত্রীর, সেটাকে দাঁড় করিয়েছে তার মনুষ্যত্ব বজায় থাকা না থাকার প্রশ্নে।

তাছাড়া,—সাধনা এ কথাটাও ভাবে,—সংসারে সে তো একা নয় স্বামী যাকে খেতে পরতে দেয়, স্বামীই যার একমাত্র গতি। সব স্ত্রীরই এক দশা। এজন্য বিশেষভাবে নিজেকে ধিক্কার দেবার কি আছে?

স্বামীত্বের অধিকার যদি রাখাল একটু খাটাতেই চায়, আর দশজনের মত সেটুকু মেনে নিলেই বা দোষ কি? সুধার মত লাথি আর চাবুক সয়ে যাবার প্রশ্ন তো নয়।

কিন্তু বেশীক্ষণ একভাবে থাকে না তার মন। পালা করে নরম আর গরম হয়, আপোষ থেকে বিদ্রোহে গতায়াত চলে।

ভোলার মা বলেছিল বিকালে আসবে।

বেলা পড়ে আসে, তার দেখা নেই। এ আবার আরেকটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সাধনার। হার বিক্রীর টাকা থেকে সে নিজেই মাকড়ি দুটো বাঁধা রেখে ভোলার মাকে পঁচিশটা টাকা দেবে ভেবেছে।

ভরি খানেক কম সোনার একটা নতুন হার সে কিনবে।

দোকানে দেখে এসেছে, ওরকম সোনাতেও সর্ব্বদা ব্যবহারের হার মন্দ হয় না।

কিছু টাকা তার বাঁচবে।

কিন্তু টাকা রাখলে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয়ে যাবে। তার তো বাসন্তীর মত অবস্থা নয় যে সংসারের খরচ থেকে বাড়তি দু'পাঁচ টাকা সরিয়ে সরিয়ে রেখে জমাতে থাকবে, খরচ করার দরকার হবে না।

তার চেয়ে মাকড়ি বাঁধা রাখলে হার বেচা পঁচিশটা টাকাও যদি টিকে যায়।

কিন্তু ভোলার মা আসে না কেন? টাকার দরকার বলে সোনা ফেলে রেখে গেছে, তার কি তাগিদ নেই এসে খবর নেবার? সাধনা নিজেই এমন অধৈর্য্য হয়ে ওঠে যে নিজেই সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

গিয়ে দিয়ে এলে কেমন হয় টাকাটা ভোলার মাকে?

ওই তো চোখের সামনে দেখা যায় কুঁড়ে ঘরগুলি। এই তফাৎ থেকেই ঘরগুলিকে একে একে সে গড়ে উঠতে দেখেছে, এখান থেকেই এতদিন তাকিয়ে দেখেছে ঘরগুলিকে। ভোলার মা ছাড়া আর কারা এখানে থাকে, কিভাবে অতটুকু ঘরে থাকে, কিছুই সে জানে না।

গেলে দোষ কি?

পাঁচটার পর আর ধৈর্য্য থাকে না সাধনার। ব্লাউজের ভিতরে টাকা নিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে হাঁটতে হাঁটতে বেড়াতে বেড়াতে পুকুর পাড় ঘুরে সে ছোটখাট কলোনিটিতে

যায়। কাছাকাছি গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সমান দূরে দূরে সাজিয়ে বসানো ছাঁচে ঢালা ছোট ছোট ঘর, টুকরো টুকরো বাগান, সরু সরু পথ—চারিদিক পরিষ্কার ঝকঝকে। ঠিক যেন ছবিব মত। ঘর হারাণো মানুষগুলি সব গড়েছে নিজের হাতে। এখনো কোনো ঘরের টুকিটাকি কাজ চলেছে, কাজ করছে স্বামী স্ত্রী তুজনে মিলে। কয়েক হাত বাগানটুকুতে পুরুষ লাগাচ্ছে সব্জিচারা, পুকুর থেকে জল এনে দিচ্ছে তার বৌ। রাস্তার কল থেকে কেউ কলসী করে জল আনছে, কেউ ধরাচ্ছে উনান, কেউ বেঁধে দিচ্ছে আরেকজনের চুল।

ভোলার মার ঘরটি পূব-দক্ষিণ কোণে। কলোনির একজন ঘরটা সাধনাকে দেখিয়ে দেয়।

সতের আঠার বছরের একটি মেয়ে বলে, কি চান?

ঃ ভোলার মা ঘরে নেই?

ঃ মা? মা ডিম বেচতে গেছে।

ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সাধনা বলে, তুমি তুর্গা, না?

মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে তুর্গা বলে, আসেন, বসেন।

একটা চওড়া বেঞ্চের মত মাটির দাওয়া, তাতে একটা তালপাতার চাটাই-এর আসন তুর্গা বিছিয়ে দেয়। বসতে বসতে সাধনা বলে, বসব কি, আমি তোমার মার খোঁজে এলাম, তোমার মা হয় তো ওদিকে আমার বাড়ী গেছে।

ভিতর থেকে পুরুষের গলা শোনা যায়, দুগ্‌গা, জিগা তো ওইটার ব্যবস্থা করছেন নাকি ?

দুর্গা বলে, মা আপনাকে মাকড়ি দুইটা দিছে না ? কিছু করছেন ?

এরা সবাই তবে জানে ? ভোলার মা চুপি চুপি লুকিয়ে মাকড়ি দু'টি বাঁধা রাখতে তার শরণাপন্ন হয়নি ! এই একটা খটকা ছিল সাধনার মনে ।

সে বলে, হ্যাঁ, ব্যবস্থা করেছি । সেইজন্যই খুঁজতে এসেছিলাম তোমার মাকে ।

গায়ে কাঁথা জড়িয়ে রাধেশ ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে । চুলে পাকধরা লম্বা চওড়া মস্ত একটা মানুষ, ঠিকমত খেতে পেলে বোধ হয় দৈত্যের মত দেখাত । কতকাল ধরে উপবাসী দেহে স্বাস্থ্যের জোয়ার নেই, শুধু ভাঁটা । হাড় আর চামড়া শুধু বজায় আছে ।

ঃ জ্বর নিয়া উইঠ্যা আইলা ক্যান ?

মেয়ের প্রতিবাদ কানেও তোলে না রাধেশ । ক'হাত তফাতে উবু হয়ে বসে ধীরে ধীরে বলে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন । ভোলার মারে কইয়া দিছিলাম, মাকড়ি তুমি বেচবা না, কিছুতেই বেচবা না । ভাল মাইন্‌ষের কাছে বাঁধা দিয়া টাকা পাইলে আনবা, না পাইলে আনবা, না । দুই মাসে পারি ছয় মাসে পাড়ি মাকড়ি আমি খালাস কইরা আনুম । মাকড়ি বেইচা বিয়া দিমু না মাইয়ার ।

রাধেশ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কয়েকবার কাসে ।

: মেয়ের বিয়ে নাকি ?

: হ। তের তারিখে লগ্ন আছে, পার কইরা দিমু।

: ভোলার মা তো বিয়ের কথা কিছু বলেনি ?

: কি কইব কন ? নামেই বিয়া, নম নম কইরা সারুম। তবু কয়টা টাকা লাগব।

পঁচিশ টাকায় মেয়ের বিয়ে! দুর্গাকে ভাল করে দেখতে দেখতে সাধনা আশ্চর্য্য হয়ে বিবরণ শোনে। এখানকারই আরেকটি কুঁড়ে ঘরে থাকে ছেলেটি, নাম তার বিষ্ণুচরণ। মা আর বিবাহিতা এক বোনকে সাথে করে এখানে মাথা গুঁজেছিল। দূরে আরেক পাড়ায় ঘর বেঁধে বোনকে তার স্বামী নিয়ে গেছে। হঠাৎ দুদিনের জ্বরে মা মরে গেছে বিষ্ণুর। কি অসুখ হয়েছিল কে জানে! হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, প্রথমে যায়গা মেলেনি, মরবার আধঘণ্টা আগে ঠাঁই পেয়েছিল সমিতির বাবুদের চেষ্টায়।

তা ওদিকে বিষ্ণুকে থাকতে হয় একা, এদিকে এতবড় মেয়ে নিয়ে তাদেরও ঝন্‌ঝাটের অন্ত নেই। শকুন হারামজাদাগুলির নজর যেন খালি খুঁজে বেড়ায় কোথায় কোন গরীব অসহায়ের ঘরে অল্প বয়সী মেয়ে আছে। দু'পক্ষে তারা তাই পরামর্শ করে বিয়েটা ঠিক করেছে। দেনা-পাওনা কিছু নেই, কাপড়গয়না থালা বাসন কিছুই লাগবে না, যেমন আছে মেয়ে আর ছেলে ঠিক তেমনি ভাবেই শুধু বিয়েটা হবে কলোনির দশজনের সামনে।

তবু শাখা সিঁদুর তো চাই, পুরুত তো চাই, টুকিটাকি এটা

ওটা তো চাই যা না হলে বিয়েই হবে না। একটি করে মিষ্টি দেওয়া হবে কলোনির সকলকে, সকলের মিলিত হুকুমেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে একটির বেশী মিষ্টি দেওয়া। পেট ভরে খাবে শুধু বিষ্টুর বোন আর ভগ্নিপতি।

তবু, পঁচিশ টাকায় বিয়ে! সাধনার বিশ্বাস হতে চায় না কিছুতেই। হাতে আরও কিছু টাকা আছে, তার সঙ্গে এই পঁচিশ টাকা যোগ হবে নিশ্চয়

ঃ পঁচিশ টাকায় কুলিয়ে যাবে? সাধনা জিজ্ঞাসা করে।

ঃ না কুলাইয়া উপায় কি? কুলান লাগব।

পঁচিশ টাকায় কুলিয়ে না নিলে বিয়ে হয় না, প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে হয় কবে আরও বেশী খরচ করার ক্ষমতা হবে সেই অজানা অনাগত দিনের আশায়। সবাই এটা বোঝে। তাই পঁচিশ টাকাতেই বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। সকলে মিলে পরামর্শ করে স্বীকৃত ব্যবস্থা।

দুর্গা চুপ করে দাঁড়িয়ে শোনে। মেটে রং, রোগা গড়ন, আধ-রুক্ষ একরাশি চুল। এত চুল বলেই বোধ হয় বিয়ের কটা দিন আগেও যথেষ্ট তেল দিয়ে চুলের রুক্ষতা সম্পূর্ণ ঘোচানো যায় নি।

হাতে দু'গাছা করে নকল সোনার চুরি, কানে ওই নকল সোনারই দুল।

কথা কইতে কইতে ভোলার মা এসে পড়ে। সাধনার কাছেই সে গিয়েছিল, আশার কাছে খবর পায় যে তাকে

এদিকে আসতে দেখা গিয়েছে। ভোলার মার অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় নি যে তার খোঁজে তাদের কুঁড়ের দিকেই গিয়েছে সাধনা।

ভোলার মা কৃতজ্ঞতা জানায় অপরূপ ভাবে!

শুধু বলে, ভাল মন্দ মানুষ চিনতে আমাগো ভুল হয় না!

অনেক দেখে অনেক ঠেকে সে নির্ভুল যাচাই করতে শিখেছে সৎ মানুষ আর অসৎ মানুষকে। সাধনার কাছেই সে গিয়েছিল মাকড়ি নিয়ে। সাধনা মানুষটা ভাল। সন্দেহাতীতভাবে ভাল!

ভোলার মাকে টাকা দিয়ে সাধনা একটু খুসী মনেই ঘরে ফেরে। উপর উপর কতটুকুই বা দেখেছে আর কতটুকুই বা জেনেছে এখানকার মানুষের দিবারাত্রির জীবন, তবু তার মনে হয় সে যেন কিছুক্ষণের জন্য নতুন একটা জগৎ থেকে ঘুরে এল। ঘরের এত কাছে জীবনের একটা অতি সহজ প্রাথমিক সত্য এমনভাবে বাস্তব রূপ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে এটা যেন এখনো তার বিশ্বাস হতে চায় না, চোখে দেখে কানে শুনে আসার পরেও! তার ধারণাতীত ছিল এই সহজ সত্যটা। এত অসহায় এত নিরুপায় হয়ে পড়েও মানুষ হাল ছাড়ে না, এমনভাবে আবার আশ্রয় গড়ে নেয়, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীবনের নতুন ভিত গাঁথে!

পঁচিশ টাকায় আয়োজন করে ছেলেমেয়ের বিয়ের!

এতদিন সাধনার কাছে বিয়ের মানেটাই ছিল রোমাঞ্চকর স্বপ্নকে বাস্তব করা উপলক্ষে হৈ চৈ আনন্দ উৎসব। সমস্ত

কিছু ছাঁটাই করে এরা বজায় রেখেছে শুধু বিয়ের প্রয়োজনটুকুকে। খরচপত্রের আনন্দ উৎসব করার সাধ্য নেই বলে দমে গিয়ে বাতিল করে দেয় নি ছেলেমেয়ের বিয়ে হওয়া।

ওখানে যেতে হবে মাঝে মাঝে। কি দিয়ে কিভাবে ওরা সংসার চালায় ভাল করে জানতে হবে।

এইটুকু সময় নিজের চিন্তা ভুলে ছিল। ঘরের তালা খুলতে খুলতে ক্ষণিকের জন্য পিছু হটা সমুদ্রের মতই তার চিন্তাভাবনা দ্বিধা সংশয় জ্বালা ভয় ছুটে এসে তার মনকে দখল করে।

এত জটিল এত বেখাপ্পা তার জীবন! অভাবের শেষ নেই একদিকে, অন্য দিকে সীমা নেই অশান্তির।

কেন এমন হয়? কেন তারা এই বিরোধ আর অশান্তি দূরে সরিয়ে দিয়ে অন্ততঃ মিলেমিশে শান্তিতে দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করতে পারে না? তাদের চেয়েও কি মনের জোর বেশী ভোলার মায়েদের? বিদ্যাবুদ্ধি বেশী?

শুধু রাখাল নয়, সকলের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে একটা আকণ্ঠ সাধ জাগে সাধনার। সবাই তারা কথা বলে পরামর্শ করে বিদ্বেষ আর ভুল বোঝা মিটিয়ে নেবে, তার মনেও কেউ আঘাত দেবে না, সেও এমন কিছুই করবে না যাতে কারো রাগ হতে পারে, দুঃখ হতে পারে।

ঝোঁকটা চাপতে পারে না সাধনা। তখনি উঠে আশার

ঘরে যায়—সরলভাবে প্রাণখুলে আশার সঙ্গে আলাপ করবে! একরকম পাশাপাশি ঘর, অথচ তারা ভুলেও একজন আরেকজনের ঘরে যায় না, একি অর্থহীন অকারণ বিরোধ!

উনানে আঁচ দিয়ে দেয়ালে টাঙ্গানো বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আশা চুল বাঁধছিল। আয়নায় সাধনাকে দেখে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায় না, সেই ভাবেই যেন আয়নায় সাধনার প্রতিচ্ছবিকে জিজ্ঞাসা করে, কি বলছ?

ঃ এমনি এসেছিলাম, গল্প করতে।

ঃ ও! বেশ তো।

মুখ ফেরায় না আশা, চুল বাঁধা স্থগিতও করে না এক মুহূর্তের জন্য। সাধনা দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে বসতেও বলে না।

সাধনা ঠিক করেই এসেছিল যে আশা কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না, নিজের মান অপমান নিয়ে মিথ্যে কাতর হবে না, অন্য সমস্ত হিসাব বাদ দিয়ে সরল সহজ প্রীতিকর কথা আর ব্যবহার দিয়ে আশাকে সে জয় করে ছাড়বে!

বড় দমে যায় সাধনা। তার কান দুটি ঝাঁঝাঁ করে। কিন্তু যেচে গল্প করতে এসে আচমকা ফিরেই বা যাওয়া যায় কি করে?

সেদিন আশাকে উপেক্ষা করে ওদের রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে গায়ের জোরে রাজীবের সঙ্গে আলাপ চালিয়েছিল। সেটা ছিল আলাদা ব্যাপার। সেটা ছিল

ওদের সঙ্কীর্ণতাকে তুচ্ছ করে গায়ের জোরে নিজের মহৎ ও উদার হওয়া।

আজ নত হয়েই এসেছে আশার কাছে। এসেছে একটা অবাস্তব মিথ্যা উদারতার ঝোঁকে!

মরিয়া হয়ে সে আব্দারের সুরে বলে, আমার চুলটা বেঁধে দাও না!

ঃ আমি পারি নে।

কাল বেড়াতে এসেছিল ঘোষালদের মেজ বৌ, আশা গল্প করতে করতে সযত্নে তার চুল বেঁধে দিয়েছিল।

অগত্যা কি আর করে, সাধনাকে বলতে হয়, অচ্ছা যাই, উনুন ধরাবো।

ঃ আচ্ছা।

প্রাণটা জ্বলে পুড়ে যায় সাধনার। আজকেই ওবেলা কড়াইশুদ্ধ মাছের ঝোল উনানে ঢেলে দেবার সময় ভাপ লেগে কিছুক্ষণ তার হাত যেমন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়েছিল।

না আপোষের ভরসা নেই, এ অশান্তির হাত থেকে তার রেহাই নেই। নিজের মনটা ঝেড়ে মুছে সাফ করে সে যদি যেচে নত হয়ে আপোষ করতে যায়, তার অপমানটাই তাতে বেশী হবে, আরও সে ছোটই হয়ে যাবে শুধু, তাছাড়া কোন লাভ হবে না।

তাকে ভুল বুঝবে মানুষ, ভাববে যে তার বুঝি কোন মতলব আছে।

এ জগতে বোঝাপড়া নেই। যে যেমন বোঝে সেটাই সে আঁকড়ে থাকবে।

গভীর হতাশা বোধ করে সাধনা। জীবন নয়, এ যেন একটা যন্ত্র। নিজের ধরা বাঁধা নিয়মে একভাবে পাক খেয়ে চলবে, কারো সাধ্য নেই এতটুকু এদিক ওদিক করে।

হৃদয়মনের কোন মূল্য নেই এই যান্ত্রিক জীবনে।

নইলে হাসিমুখে ছাড়া কথা ছিল না যে রাখাল আর তার মধ্যে, একটু মুখ ভার করলে পাঁচ মিনিটে যে রাখাল তার মুখে হাসি ফুটিয়ে ছাড়ত, সেই রাখাল নিজে আঘাত দিয়ে তাকে আহত করেও অনায়াসে তাকে উপেক্ষা করে চলেছে!

সকাল সকাল রাখালকে বাড়ী ফিরতে দেখে বুঝি আশা জাগে সাধনার।

: কিছু হল নাকি?

: না।

: চাকরীটা কিসের?

: জোচ্চুরি করে জেলে যাবার।

সাধনার মুখ ছোট হয়ে যায়।

: ব্যাপারটা কি হল বল না?

: বলব আবার কি? নিজেরা একটা ফাঁদে পড়েছে, আমায় জবাই করে বাঁচবার মতলব ছিল। নইলে যেচে কেউ চাকরী দিতে চায়?

তার সঙ্গে ভাল করে কথাও কি বলতে চায় না রাখাল?

তার আগ্রহ টের পায় না? এমন ভাসা ভাসা জবাব দেবার নইলে আর কি মানে থাকতে পারে!

অনেক কথা বলার ছিল সাধনার। কিন্তু তার সঙ্গে যার কথা বলার সাধ নেই তাকে নিজের কথা গায়ের জোরে যেচে যেচে শুনিয়ে আর লাভ কি? যেচে তাকে চাকরী দিতে চাওয়ার মধ্যে মতলব ছিল রাজীবের, কিন্তু সে যা ভেবেছিল সে রকম মতলব নয়, অন্য মতলব ছিল, এ প্রমাণ পেয়ে কি একটু নরম হওয়া উচিত ছিল না রাখালের? যে বিশ্রী মতলবের ইঙ্গিত সে আজকেই করেছিল চাকরীটার খোঁজে বেরোবার আগে, সে কথা মনে করে সাধনার কাছে একটু লজ্জা পাওয়াও কি উচিত ছিল না তার?

রেবার বিয়েতে যাওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়েছে বলে কি সম্পর্ক চুকে গিয়েছে তাদের!

এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটাতে হয়।

কী বিড়ম্বনা জীবনে!

সাধনাকে অমানুষ মনে হয় রাখালের। গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে মনে হয় একটা সচল মাংসপিণ্ডে যেন ক্ষুদ্র স্বার্থপর একটুকরো প্রাণ বসিয়ে জীবন্ত মানুষটা তৈরী হয়েছে। হয় তো কোন দোষ নেই সাধনার। সংসার তাকে গড়ে তুলেছে এমনিভাবে, ছোট করে দিয়েছে তার মনটাকে। হয় তো প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করলে খানিকটা সংশোধন সে করেও নিতে পারত তাকে।

কিন্তু সে জন্য তো বাতিল হয়ে যায় না এ সত্যটা যে সে অতি নীচুস্তরের ঘৃণ্য মানুষ।

সেই সাধনা, যার হাসি দেখে তার প্রাণ জুড়িয়ে যেত। যার সরল নির্ভর, শান্ত মধুর প্রকৃতি আর কেরানীর সংসারের স্বল্প আয়োজন নিয়েই সংসার করার আনন্দে মসগুল হয়ে থাকার ক্ষমতা দেখে মনে হত, কত সৌভাগ্য তার যে এমন বৌ পেয়েছে!

আজ কি স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়েছে তার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ হৃদয় আর অবুঝ একগুঁয়ে মনের পরিচয়। এ পরিচয় কি করে এতদিন তার কাছে গোপন ছিল ভাবলেও বিস্ময় বোধ হয়!

হয় তো তাই হবে। এ সব ছোট হৃদয় ছোট মনের মানুষ অল্প পেয়েই খুসীতে গদগদ হয়ে যায়, নিজেকে ধন্য মনে করে। তখন হয়ে থাকে একেবারে অন্যরকম মানুষ!

আবার সেটুকুর অভাব ঘটলেই একেবারে বিগড়ে যায় এ সব মানুষ। একেবারে বিপরীত রূপটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

জীবন খালি হয়ে গেল, শরীরে খালি হয়ে এল জীবনী শক্তি, সোণার হারের অভাবে খালি গলার শোকেই সে আকুল! রেবার বিয়েতে যাওয়ার ছলে সে গড়িয়ে নিতে চায় নতুন হার! ক'দিন জগৎ সংসার তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে, ভাতের হাঁড়ির মত হয়ে আছে তার মুখ, অস্থির উন্মনা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে তার কথাবার্ত্তা চালচলন!

তার নিজের বা তার ছেলের বা স্বামীর একটা অসুখ হলে চিকিৎসা হবে না জানে, অথচ নতুন হার গলায় দিয়ে

সেজেগুজে রিয়ে বাড়ীতে গিয়ে কনেকে নিজের কানপাশা উপহার দিতে পারবে না বলে, দশজন আত্মীয়বন্ধুর কাছে মিথ্যা সম্মান মিথ্যা সমাদর পাবে না বলে, পাগল হয়ে যেতে বসেছে!

তাকে আর তার রকমসকম দেখে কে না বুঝবে যে এটা শুধু তার একটা জোরালো সাধ নয়, সাধটা না মিটলে সে শুধু গভীর মনোবেদনা পাবে না—এটা তার জীবনের চরম কামনায় দাঁড়িয়ে গেছে, এ কামনা না মিটলে হয় তো সে সত্যই পাগল হয়ে যাবে।

ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয় রাখালের। নিরুপায় বিদ্বেষে নিশ্বাস তার আটকে আসতে চায়

নতুন হার তাকে এনে দিতেই হবে। নিয়েও যেতে হবে রেবার বিয়েতে। তাছাড়া উপায় নেই। এই সামান্য ব্যাপারে মাথা বিগড়ে দেওয়া যেতে পারে না সাধনার। যত প্রতিক্রিয়া হবে সব ভোগ করতে হবে তো তাকেই।

ছেলেটার কথাও তো ভাবতে হবে।

রাখালকে সাধনার পাষণ্ড মনে হয়। রক্তমাংসের মানুষ নয়, অস্বাভাবিক অমানুষিক কিছু দিয়ে গড়া। চোখ ফেটে তার জল আসতে চায়। যে রাখাল এত বড় বড় কথা বলত, এত ছোট তার মন? পাশাপাশি শুয়েও সে ভুলতে পারে না তাদের কলহ হয়েছে? পাশাপাশি শুয়ে নীরব উপেক্ষায় তাকে কাবু করে কলহে জয়ী হতে চায়? এত সে নীচ?

সাধনার সহ্য হয় না। সে উঠে গিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে।

রাখাল বলে, কি হল?

সাধনা বলে, কি আবার হবে!

রাখাল একটু চুপ করে থেকে বলে, কাল তোমার হারটা বদলে আনব। এতই যখন ইচ্ছা তোমার, রেবার বিয়েতে নিয়ে যাব।

উঠে বসে আর্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে সাধনা বলে, ছাখো, আমিও একটা মানুষ! ওরকম কোরো না তুমি আমার সঙ্গে। একদিন বাড়ী ফিরে আমাকে আর দেখতে পাবে না।

রাখাল চুপ করে থাকে। সেটা আর আশ্চর্য্য কি? যে মতিগতি সাধনার, যেরকম অবুঝ সে, অজ্ঞান মানুষ, তারই জন্য সারাদিন বাইরে প্রাণপাত করে ঘরে ফিরে তাকে দেখতে না পাওয়া আশ্চর্য্য কিছুই নয়।

রাখাল চুপ করে শুয়ে চোখ বুজে ভাবে।

কিন্তু এতদূর তো গড়াল গলার একটা হার আর বিয়ে বাড়ী যেতে চাওয়ার উপলক্ষে, শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে? আর কি উপলক্ষ আসবে না? দিন দিন কি আরও বিগড়ে যেতে থাকবে না সাধনার মন?

আসল কথা, এ দারিদ্র্য সইবার শক্তি নেই সাধনার। আর কিছুদিন এভাবে চললে সে ভেঙ্গে পড়বেই।

সাধনা ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু রাখালের চোখে ঘুম আসে না।

জেগে থেকে চোখ বুজে সে ক্রমে ক্রমে সাধনার অপমৃত্যু ঘটতে দেখতে পায়।

শুধু সাধনা মরছে না, তাকেও ঘায়েল করে দিয়ে যাচ্ছে।

৭

ভাঙন ধরলে এমনি তির্য্যকগতি পায় মধ্যবিত্তের বুদ্ধি বিবেচনা। ধরা বাঁধা পথ ছেড়ে দিতে হলেই সুরু হয় তার এঁকে বেঁকে পাক দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে চলা। যতক্ষণ না নতুন পথ সুনিশ্চিত হয়ে যায়, সোজা চলার পথ সে খুঁজে পায় না। মধ্যবিত্তের বিপ্লব তাই আসে অতি বিপ্লব আর প্রতি বিপ্লবের মারফতে, যতক্ষণ না প্রকৃত বিপ্লব রূপ নেয়।

সকালে বিশুকে পড়াতে গিয়ে বাড়ীর ভিতরে ঢুকেই রাখাল বিশুর মাকে দেখতে পায়। গরদের শাড়ী পরে সদ্য স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, সর্ব্বাঙ্গে তার ঠিক আগের মতই গয়নার অভাব।

ঃ কখন ফিরলেন ?

বিশুর মা দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বলে, কাইল ফিরছি বাবা। ওই।দন ফিরুম ভাবছিলাম, কুটুম ছাড়ল না। শুক্‌না ক্যান দেখায় তোমারে, খারাপ নাকি শরীর ?

ঃ না, শরীর ভালই আছে।

পড়াতে পড়াতে বার বার সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, খেই

হারিয়ে ফেলে। বিশুর মত ভোঁতা ছেলেও টের পায় আজ কিছু হয়েছে তার মাষ্টারমশায়ের।

নির্মলা আজও তাকে প্রসাদ দিয়ে যায়। কালীঘাটে পূজা দেওয়ার প্রসাদ, বিশুর মার সঙ্গে এসেছে।

নির্মলা বলে, এই ঘরে তো পড়াইতে পারবেন না আইজ। ঠাকুরের পূজা সুরু হইবো। বড় ঘরে বসেন গিয়া।

আজ পূর্ণিমা খেয়াল ছিল না রাখালের। প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে সকাল সন্ধ্যায় বিশেষভাবে ঠাকুরের পূজা হয়।

বিশুর মার শোয়ার ঘরখানাই এ বাড়ীর সেরা ঘর। নির্মলা সেই ঘরের মেঝেতে দামী চিকণ পাটি বিছিয়ে দেয়। এটি শীতল-পাটিও বটে। বেত অথবা অন্য কিসের ছাল দিয়ে এ পাটি তৈরী হয় রাখাল জানে না। ছাল বাকল দিয়ে যে এমন মসৃন আর পাতলা জিনিষ তৈরী হয় এটাও তার আগে জানা ছিল না। পাকিয়ে রাখলে বাঁশের চেয়ে মোটা হয় না, বিছিয়ে দিলে এতখানি ছড়িয়ে যায় যে চার পাঁচজন অনায়াসে শুতে পারে।

একদিকের দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড ভারি খাট, একেবারে নতুন। দেশ থেকে খাট আনা যায় নি, কিন্তু খাটে না শুয়ে বোধ হয় ঘুম আসে না বিশুর মা আর সতীশের। তাই নতুন খাট কেনা হয়েছে। অন্যদিকের দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলি ছোট বড় ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেশ—সব রঙীন কাপড়ের বোরখায় ঢাকা। দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো

কার্পেটে তোলা কাঁচা ছবি আর কাঁচা হরফের বাণী—রাধা কৃষ্ণের কোন অঙ্গ সরু কোন অঙ্গ মোটা, 'পতি পরম গুরু' আপন গুরুত্বে আপনিই এলিয়ে পড়েছে। খানিক পরেই শঙ্খ ঘণ্টা বেজে ওঠে। পূজা সুরু হয়। বিশুর মা একবার ঘরে এসে বাক্স খুলে পুরানো দিনের দু'টি রূপোর টাকা নিয়ে যায়।

পুরুতকে আজও সে পুরাণো দিনের জমানো রূপার টাকা দিয়ে দক্ষিণা দেয়। এ টাকা ফুরিয়ে গেলে বাজে ধাতুর টাকা বা ছাপানো নোটে দক্ষিণা দিতে হলে না জানি কত মর্মাহত হবে বিশুর মা!

বিশুকেও যেতে হয় ঠাকুর ঘরে। বিশুর মা নিজে এসে ছেলেকে ডেকে নিয়ে যায়।

আধ ঘণ্টা পরে বিশু ফিরে আসামাত্র রাখাল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আজ আর সময় নেই। আটটা বেজে গেছে। আমি যাচ্ছি।

মনে হয় সে ভীষণ চটে গেছে ঠাকুর পূজার নামে তার ছাত্রের পড়াশুনার গাফিলতিতে।

বিশু ভয়ে ভয়ে বলে, আমারে ডাইকা নিয়া গেলো—

ঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

তাড়াতাড়ি সে সিঁড়ি দিয়ে নামে। যেন একরকম পালিয়ে যাবার মত অতি ব্যস্ততার সঙ্গে সে চলে যেতে চায় এবাড়ী ছেড়ে।

নির্ম্মলা তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বলে, শোনেন, শোনেন, প্রসাদ নিয়া যান।

সিঁড়ির নীচে একতলা এখন জনশূন্য। বুড়ী রাজু শুধু একমনে বাসন মেজে চলেছে কলতলায়।

নির্মলা বলে, পুরুষ মানুষের এত তাড়া? কই যাইবেন?

ঃ আরেকটি ছেলে পড়াতে যাব।

ঃ ইস্! একেবারে বিশ্রাম পান না। ক্যান এত খাইট্যা মরেন আপনে? কার লেইগ্যা খাটেন? আমার সয়না আপনার কষ্ট।

এ মিথ্যা আবেগ নয়। নির্মলার চোখে মুখে ফুটে পড়ে তার দরদ। ব্যাকুল দু'টি চোখ সে পেতে রাখে রাখালের মুখে। তবু, ভয়ঙ্কর এক বিপদের মতই তাকে মনে হয় রাখালের।

নির্মলা তার হাত ধরে। বলে, ঘরে আইসা দুইদণ্ড বসেন। আসেন দুইটা কথা কই।

ঃ আজ নয়, আরেকদিন।

কিন্তু এ সুযোগ তো আসবে আবার একমাস পরে, আরেকটা পূর্ণিমা এলে।

ঃ ডরান নাকি?

রাখাল মাথা নাড়ে।—দরকার আছে।

ঃ তবে ওই বেলা আইবেন? সন্ধ্যাকালে? দুই ঘণ্টা পূজা হইব।

ঃ যদি পারি আসব।

রাখাল আর দাঁড়ায় না। বাইরে গিয়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডেলে পা ঢুকিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে।

ক্ষুব্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে :নির্ম্মলা তার পালিয়ে যাওয়া চেয়ে দেখে।

সোনা যে ওজনে এত ভারি রাখালের জানা ছিল না। বিশুর মার সেকেলে ধরণের গয়নাগুলিও বেশ পরিপুষ্ট। কোঁচায় বাঁধা ক'খানা মাত্র গয়নার ওজনটা রাখাল প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করে।

ভোলার মা আজও ডিম বেচতে বেরিয়েছে, প্যাসেজে ডিমের টুকরি সামনে রেখে সে উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল আশার জন্য। আশা হাত ধুয়ে এসে দর করে পছন্দ করে ডিম কিনবে।

ভোলার মা'ই রাখালকে সাবধান করে দেয়, ব্যাগটা পইড়া যাইবো, ঠিকভাবে থোন।

টাকা নেই, কিন্তু পুরাণো সখের মনিব্যাগটা আছে। পড়ি পড়ি অবস্থা থেকে ব্যাগটা পকেটের ভিতর ঠেলে দিয়ে রাখাল ঘরে চলে যায়।

আজও সোজা দু'নম্বর ছাত্রটিকে পড়াতে চলে যাবার বদলে তাকে বাড়ী ফিরতে দেখে নানা কথা মনে হয় সাধনার। আজও কি রাখাল প্রত্যাশা করেছে যে সাধনা নিজে থেকে মুখ ফুটে তাকে হারের কথা বলবে?

সামনা সামনি এ টালবাহনা অসহ্য মনে হওয়ায় সাধনা ঘর থেকে বেরিয়ে তার উনানের পাশে চলে যায়। তাতে সুবিধাই হয় রাখালের। কোঁচা থেকে খুলে গয়না ক'টা

একটুকরো ন্যাকড়ায় বেঁধে একখানা আস্ত খবরের কাগজে জড়িয়ে পুঁটলি করে নেবার সুযোগ পায়।

চাকরীর খবরের আশায় আজও সে প্রতি রবিবার দু'খানা কাগজ কেনে, মাঝে মাঝে দরখাস্তও পাঠায়।

বিছানায় স্থির হয়ে বসে মিনিটখানেক সে ভাবে। নিজের ভিতরটা তার এত বেশী ধীর শান্ত মনে হয় যে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙ্গানো আয়নায় নিজের মুখ দেখে প্রায় চমকে ওঠে।

গামছায় মুখ মুছে সে মৃদুস্বরে সাধনাকে ডাকে। সাধনা ঘরে এলে বলে, তোমার হারটা দাও।

ঃ কেন ?

ঃ আজ একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।

ঃ তোমার কিছু করতে হবে না।

ঃ করতে হবে না ?

ঃ না যা করবার আমিই করব।

একটু যদি ভাববার সময় পেত সাধনা। আচমকা ডেকে বিনা ভূমিকায় হারের কথা না তুলে তার প্রস্তাবের জবাব দেবার জন্য কয়েক মিনিট প্রস্তুত হবার সময় যদি রাখাল তাকে দিত। এমন স্পষ্টভাবে সোজাসুজি রাখালকে বাতিল করে দেওয়ার বদলে এই সুযোগে সে নিশ্চয় রাখালকে জানিয়ে দিত যে হারের ব্যবস্থা সে ইতিমধ্যেই অর্দ্ধেকটা করে ফেলেছে।

রাখাল চলে যাবার পর সাধনা এই কথাই ভাবে আর আপশোষ করে। রাখাল নিজে থেকে নরম হয়ে তার কাছে

হার মানতে চাইল আর সে কিনা সংঘাতের জের টেনে আরও উগ্র, আরও কঠিন হয়ে উঠল !

রাস্তায় নেমে রাখাল ভাবে, এই তো স্পষ্ট লক্ষণ বিকারের। হিসাব তার ভুল হয় নি, মাথা সাধনার বিগড়ে যেতে বসেছে। কঠিন রোগের চিকিৎসার মতই এই কঠিন দারিদ্র্যের চাপ থেকে সাধনাকে একটু মুক্তি দেওয়া আজ একান্ত ভাবে জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে দুর্দ্দশা হয়ত তার একদিন ঘুচবে, সাধনাকে সুখে রাখার ক্ষমতা হবে, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হবে না তখন। আজকের বিকৃতিকে সারাজীবনের বিকারের বোঝা করে নিয়ে একটা অসহ্য বোঝার মতই হয়ে থাকবে সাধনা।

হাতের কাগজে মোড়া পুঁটলিটার ওজন থেকে এতক্ষণে যেন বুকে বল পায় রাখাল। যাই সে করে থাক, সাধনাকে বাঁচাবার জন্য করেছে। জীবনের অনেকটাই এখনো বাকী তার উপায় কি !

পোদ্দারের দোকানে গয়নাকটা বিক্রী করে রাখাল একুশ শ' সাতান্ন টাকা পায়। কত হাঁজার টাকার গয়নাই যে আছে বিশুর মার ! সমস্ত সোণার কত সামান্য একটু অংশ সে এনেছে। পোদ্দার কয়েক শ' টাকা ঠকিয়েছে ধরে নিলেও তারই দাম পাওয়া গেছে দু'হাজারের বেশী।

তাকে আরো বেশী ঠকাবার সাধ ছিল পোদ্দারের।

বুক ভরা লোম আর মুখ ভরা মেছেতার দাগ পোদ্দারটির। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে কষ্টি পাথরে ঘষে

যাচাই করতে করতে সে যখন মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে তার দিকে তাকায়, বলতে থাকে যে অনেক ভেজাল আর ময়লা মেশানো আছে গয়নাগুলির সোনার অঙ্গে, গিনির চেয়েও বিশ টাকার মত কম হবে এ সোনার দর, ব্যাপারটা রাখাল বুঝতে পারে।

বুঝতে পারে যে তার ভাবসাব দেখেই পোদ্দার অনুমান করে নিয়েছে পিছনে গোলমাল আছে তার এই গয়না বেচতে আসার।

এক মুহূর্ত্তের জন্য অবসন্ন বোধ করে রাখাল।

এক মুহূর্ত্তের জন্যই। এক মুহূর্ত্তে সে যেন নিজের সমস্ত জীবনের মূলমন্ত্র মনে মনে আউড়ে নেয়। না, সে চোর নয়। সে চুরি করে নি।

এ দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

মুখ গম্ভীর করে কড়া সুরে সে বলে, তবে থাক, অন্য জায়গা দেখি। বিশ টাকা কম! একি তামাসা পেয়েছ? আমার ঘরের জিনিষ, আমি জানি না সোনা কেমন?

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়, রেগে বলে, থাক্ না মশায়, অত ঘষবেন না। আমার বাড়ীতে বিপদ, নষ্ট করবার সময় আমার নেই।

পোদ্দার সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে যায়।

সবিনয়ে বলে, বসেন না বাবু, বসেন। ভুল সবারি হয়। ওহে সুবল, তুমি একবার ছাখো দিকিন—

তারপর একেবারে বিশ টাকা নয়, গিনি সোনার বাজার

দরের চেয়ে চারটাকা কম ধরা হয় তার সোনার দাম। এ-বাবদে ও-বাবদে অবশ্য আরও কিছু বাদ যায়।

তা যাক। গলা কাটার অধিকার নিয়ে সকলে সব ব্যবসা করবে এটাই প্রথা, এটাই প্রকাশ্য স্বীকৃত নিয়ম। একেও গলা কাটতে না দিলে চলবে কেন।

বাড়ী ফেরবার পথে সেই দোকানে বসে ঘণ্টুর দেওয়া এক কাপ চা খায়। বুকের কাঁপুনি একটু সামলে নেবার জন্য নয়, বুকে তার এতটুকু কাঁপন ধরে নি। শক্ত পাথর হয়ে গেছে হৃদয়টা। বিবেকের দংশনে কাতর হবার বিলাসিতা কি পোষায় তার মত লোকের ?

ভয় ? না এতটুকু ভয়ও তার নেই। ভয় পাবার কোন প্রয়োজনও সে অনুভব করে না। আবার কোন বিশেষ উপলক্ষে গায়ে গয়না চাপাবার দরকার হলে তবেই হয় তো বিশুর মা টের পাবে তার গয়না কয়েকখানা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোন কারণে আজকেই যদি টের পায়, যদি তাকে সন্দেহও করা হয়, কিছুই তার করতে পারবে না ওরা।

ঘরেই তাদের অনেক লোক, অনেক বাজে লোক। তাদের সকলকে বাদ দিয়ে তাকে জোর করে সন্দেহ করার সাহস পর্য্যন্ত ওদের হবে না।

ওসব চিন্তা নয়। শান্ত হয়ে বসে একটু তার ভাবা দরকার টাকাগুলি কিভাবে ব্যবহার করবে।

সব টাকাই কি কাজে লাগাবে এই অসহ্য দারিদ্র্য সাধনার পক্ষে একটু সহনীয় করে আনতে, যত দিন পারা যায়? অথবা খানিকটা এই কাজে লাগিয়ে বাকীটা লাগাবে কোন স্থায়ী উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টায়?

সে চোর নয়। এ জগতে কারো কোন ক্ষতি না করে একজনের একস্তূপ অকেজো এবং অকারণ সোনার একটু অংশ না বলে নেবার সুযোগ আরও দু'একবার পাওয়া যাবে, এ চিন্তাটাই হাস্যকর। এ টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার সে নিরুপায় হয়ে পড়বে একান্ত ভাবেই।

খুব সাবধানে চারিদিক হিসাব করে সব কিছু বিচার করে এ টাকা কাজে লাগাতে হবে।

শুধু সাময়িকভাবে নয়, সাধনাকে বাঁচবার একটা স্থায়ী ব্যবস্থাও যাতে সম্ভব হয়।

টাকাগুলি রাখবে কোথায়? বাড়ীতেই রাখবে। না, তার কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই। টাকাগুলি ধরা পড়লে অবশ্য সত্যই সেটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে যে সে-ই গয়না নিয়েছে, বিপদেও সে পড়বে। কিন্তু সে চোর নয়, এ বিপদকে ভয় করলে তার চলবে না। টাকাটা সাবধানে লুকিয়ে রাখার ফন্দি ফিকির আঁটতে গেলেই সে মনে প্রাণে এবং কার্য্যতঃ চোর হয়ে যাবে!

সে চোর নয়। সে চুরি করে নি। কেউ তার কিছু করবে না, করতে পারবে না। এই বিশ্বাস তার একমাত্র

অবলম্বন। ভয়ের তাড়নায়, বিপদের কল্পনায় আত্মরক্ষার অস্বাভাবিক উপায় খুঁজে এই বিশ্বাসের গোড়া আলগা করে দিলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে তার।

শেষ পর্য্যন্ত জগৎ যদি তাকে চোর বলে জানে, তাকে চোরের শাস্তি দেয়, এই বিশ্বাসের জোরেই মাথা উঁচু করে পরম অবজ্ঞার সঙ্গে সেই শাস্তি সে গ্রহণ করতে পারবে।

ঘণ্টু বলে, একটা চপ খাবেন বাবু? কাটলেট?

একুশ শ' সাতান্ন টাকা সাড়ে এগার আনা পয়সা সঙ্গে আছে, তবু রাখাল মাথা নেড়ে বলে, না কিছু খাব না।

চপ কাটলেট খাবার পয়সা কোথায়? তার নিজের সাড়ে এগার আনা থেকে এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে, চপ কাটলেট খেলে তার চলবে কেন?

তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এ টাকা সেজন্য নয়।

বাড়ী ফিরতেই সামনে পড়ে সঞ্জীব।

এই নিরীহ গোবেচারী মানুষটা বাড়ীতে তাকে এড়িয়ে চলে বলে কিছু মনে করে না রাখাল। কেন এড়িয়ে চলে জেনে বরং তার একটু অনুকম্পা মেশানো করুণাই জাগে। আশার ভয়ে সে বাড়ীতে তার সঙ্গে মেশে না, সেজন্য মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে বলে রাস্তায় বা দোকানে দেখা হলে যেচে নানা কথা আলাপ করে!

ঃ আপিস যান নি?

মুখ কাঁচুমাচু করে সঞ্জীব বলে, না, আজকে যাই নি। শরীরটা ভাল নেই—

মরার মত একটু সে হাসবার চেষ্টা করে। ভয়ে ভয়ে ঠিক চোরের মতই এদিক ওদিক চেয়ে ঘরে চলে যায়।

বোধ হয় নিষিদ্ধ মানুষ তার সঙ্গে কথা বলার জন্য!

আশাকে তার এই পিটানি খাওয়া শিশুর মত ভয় করে চলা উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া মনে হয়। মনে হয় এ বুঝি শুধু নিরীহ মানুষের বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্ন নয়, আরও কিছু আছে এর পিছনে, আশার কাছে সে বোধ হয় গুরুতর কোন অপরাধে অপরাধী!

ঘরে গিয়ে কাগজে মোড়া নোটের বাণ্ডিলটা তার সুটকেশে কাপড়ের তলায় রেখে রাখাল সাধনার কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে আসে। তাকে বুকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করতে করতে চিন্তাগুলি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, বাইরে গোলমাল শুনে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ায়!

এক মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণে মনকে শক্ত করে দৃঢ়পদে সে বাইরে আসে।

না, তার খোঁজে তার কাছে কেউ আসে নি।

আদালত থেকে লোক এসেছে ডিগ্রি জারি করে সঞ্জীবের অস্থাবর মালপত্র ক্রোক করতে!

আদালতের লোকের সঙ্গে পাঞ্জাবী গায়ে মোটাসোটা মাঝ বয়সী যে লোকটি এসেছিল, সে সঞ্জীবকে বলে, বেশ লোক তো তুমি, বাঃ! হাতে পায়ে ধরে এক ঘণ্টা সময়

চেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে লুকিয়ে আছো? সেই থেকে আমরা গাছতলায় ঠায় বসে আছি তোমার জন্য!

সঞ্জীব কথা কয় না।

লোকটি আবার বলে, ভেবেছিলে আমরা মতলব বুঝি নি তোমার? এক ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়ে মালপত্র সরিয়ে ফেলবে? গাছতলায় বসে নজর রাখব ভাবতে পার নি, না?

মাঝে মাঝে সকালের দিকে লোকটিকে আসতে দেখা গেছে সঞ্জীবের কাছে। এসে কড়া নাড়তেই সঞ্জীব তার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে যেত। আজ বোঝা যায়, সে আসত পাওনা টাকার জন্য তাগিদ দিতে!

রান্না ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আশা হাঁ করে বড় বড় চোখে চেয়ে ছিল, সঞ্জীব হঠাৎ ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলতে সে ছুটে আসে।

ঃ কি হয়েছে? কি হয়েছে? এসব কি ব্যাপার?

রাখাল এগিয়ে এসে সোজাসুজি ধমক দেয় সঞ্জীবকে, বলে, কাঁদছেন কেন কচি ছেলের মত? ঘরে যান, ঘরে গিয়ে দু'জনে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলুন, পরামর্শ করুন।

অন্য অবস্থায় তার স্বামীকে রাখাল এভাবে ধমকালে আশা বোধ হয় তার গালে একটা চাপড় বসিয়ে দিত! আজ সে নীরবে তার কথাই মেনে নেয়।

সোজা ঘরে চলে যায়। গিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ে তার হাল্‌কা খাটের পরিষ্কার ধবধবে বিছানায়। সঞ্জীবও ঘরে যায় ধীরে ধীরে।

রাখাল বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

পাওনাদার লোকটিকে বলে, দশ মিনিট সময় দিন বেচারাদের। বুঝতে পারছেন তো, ভদ্রলোক বাড়ীতে কিছু জানান নি? এবার হয় তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সাধনা এসে দাঁড়িয়েছিল রোয়াকে। তার মুখ দেখে মনে হয় সে যেন এইমাত্র আকাশ থেকে তার অজানা অচেনা এই অদ্ভুত পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে।

আশাদের ঘরের ভিতর থেকে প্রথমে কোন কথাই শোনা যায় না বাইরে। একটু পরেই গলা চড়ে যায় আশার। তার প্রতিটি কথা স্পষ্ট কানে আসে।

ঃ আমায় না জানিয়ে তুমি এত টাকা দেনা করেছ! দেনা করে রেডিও কিনেছ, কাপড় গয়না কিনেছ আমার জন্য! এ দুর্বুদ্ধি কে দিল তোমাকে?

ঃ কি করব? মাইনেতে কুলোয় না—

ঃ সে কথা বলতে পারতে না আমায়?

ঃ বলি নি? কতবার বলেছি, টাকায় কুলোচ্ছে না, খরচা না কমালে চলবে না—

ঃ ওভাবে তো সবাই বলে। এদিকে বলছ খরচ কুলোয় না, ওদিকে সখ করে রেডিও কিনে আনছ। কি করে আমি বুঝব তোমার সত্যি কুলোয় না?

ঃ আমি—

ঃ চুপ কর। চুপ কর তুমি। এখন কি উপায় করা যায় ভাবতে দাও আমায়!

তার রান্নাঘর থেকে পোড়া গন্ধ বার হয়। সাধনা তাড়াতাড়ি গিয়ে কড়াইটা উনান থেকে নামিয়ে রেখে আসে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর অন্ধকার থমথমে মুখ নিয়ে আশা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। পাড়ার যে হু'চারজন লোক ব্যাপার জানতে এসেছিল এবং এতক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে একবার চেয়ে রাখালকে সে জিজ্ঞাসা করে, কাছাকাছি দোকান আছে রাখালবাবু, গয়না কেনে ?

ঃ বাজারের দিকে আছে।

ঃ আপনি একটু সঙ্গে যাবেন ওনার ? আমার কটা গয়না বেচে টাকা নিয়ে আসবেন ?

রাখাল বলে, ব্যাঙ্কে একাউণ্ট নেই আপনাদের ?

সঞ্জীব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, মৃহু স্বরে সে বলে, আছে, টাকা নেই।

রাখাল বলে, আমি বলি কি, গয়না না বেচে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে লোনের ব্যবস্থা করুন। গয়না বেচলেই লোকসান।

আশা দারুন হতাশার সুরে বলে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তো পাব কম ? ইনি যে আরও কয়েক যাগায় দেনা করে বসেছেন। একেবারে বেচে না দিলে কি সব শোধ করা যাবে ?

ঃ তাদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নেবেন। একবারে কিছু দিয়ে তারপর মাসে মাসে কিছু কিছু শোধ দেবেন।

আশা নিশ্বাস ফেলে বলে, তাই ভাল। আপনি একটু সঙ্গে যাবেন তো? ওঁকে দিয়ে আমার ভরসা হয় না!

আশা অনায়াসে একথা বলে এবং কথাটা কারো কানে বাজে না,—সাধনারও নয়! কে না জানে যে আশাব ভয়েই সঞ্জীব রাখালকে বাড়ীতে এড়িয়ে চলে কিন্তু মানুষকে এড়িয়ে চলার মত শক্ত নয় বলে পথে ঘাটে দোকানে দেখা হলে রাখালের সঙ্গেই সে গায়ে পড়ে যেচে আলাপ করে। সেই আশা এখন বুদ্ধি পরামর্শ চাইছে রাখালের কাছে, ঘোষণা করেছে যে রাখাল ছাড়া সঞ্জীবকে দিয়ে তার ভরসা নেই! এসব কথা মনে পড়ে কিন্তু তুচ্ছ হয়ে যায়। এখন সে বিপদে পড়েছে, এখন তো বিচারের সময় নয় আশার।

আশার এই আকস্মিক বিপদ সামলে দেবার দায়িত্ব রাখাল আগেই নিয়েছে—যখন সে সঞ্জীবকে ধমক দিয়ে আশার সঙ্গে ঘরের মধ্যে পরামর্শ করতে পাঠিয়েছিল।

সে ছাড়া কার ভরসা করবে আশা?

সঞ্জীব পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে। রাখাল কথা বলে পাওনাদার লোকটির সঙ্গে। গায়ের গয়না বাক্সের গয়না পুঁটলি করে এনে আশা হাতে তুলে দেয় রাখালের!

হাঙ্গামা সেরে রাখাল ফেরা মাত্র ঘরে গিয়ে সাধনা বলে, এটা কি রকম ব্যাপার হল? 'এমন ছেলেমানুষ ভদ্রলোক?

ঃ ছেলেমানুষ, তবে খুব বেশী আর কি এমন ছেলেমানুষ?

সখের জন্য খেয়ালের জন্য যথা সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দেয় না লোকে ? এ তো শুধু স্ত্রীকে খুসী রাখার জন্য কিছু দেনা করেছে। ভেবেছিল সামলে নেবে, জের টেনে চলতে চলতে বেসামাল হয়ে পড়েছে।

ঃ সব গোপন রেখেছিল স্ত্রীর কাছে !

ঃ গোপন না রাখলে কি খুসী রাখা যেত স্ত্রীকে ? স্বামী দেনা করে তাকে আরামে রেখেছে জানলে কোন স্ত্রী খুসী হয় ? এতটা গড়াবে এটা তো ভাবেনি সঞ্জীব। তারপর বেকায়দায় পড়ে দিবারাত্রি দুশ্চিন্তা করতে করতে একটু দিশেহারা হয়ে গেছে। নইলে মাল ক্রোক করতে এসেছে, গাছতলায় তাদের বসিয়ে রেখে এসেও মুখ ফুটে স্ত্রীকে বলতে পারে না ব্যাপারটা, চুপ করে বসে থাকে ?

ঃ তাই বটে। পুরুষ মানুষ কি ভাবে কেঁদে ফেলল !

ঃ পুরুষ মানুষের কি কাঁদা বারণ ?—রাখাল হাসে, বলে, মাঝে মাঝে আমিও ভাবতাম, চাকরীর পয়সায় মানুষটা এমন চাল বজায় রেখেছে কি করে! আজকালকার দিনে দেড়শো দুশো টাকায় দু'টি মানুষেরও ভালমত খাওয়া পরা থাকা চলে না।

রাখালের ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল সাধনা, লক্ষ্য করে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে কোন বোঝাপড়া হয় নি তাদের, কোন কথাই হয় নি। এমন সহজভাবে রাখাল কথা বলছে, হাসছে, যেন তাদের মধ্যে কোন বিবাদ বা বিভেদ কোনদিন ছিল না, এখনও নেই।

আশাদের এই খাপ ছাড়া ব্যাপারটা ঘটায় রাখাল কি এখনকার মত একেবারে ভুলে গেছে সব ?

সে নিজেও যে সহজভাবেই কথা বলছে রাখালের সঙ্গে এটা খেয়াল হয় না সাধনার।

খেয়ে উঠে রাখাল বলে, কই তোমার হারটা দাও।

সাধনা খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে।

ঃ তামাসা করছ না তো ? এতকাণ্ডের পর তুমি যেচে—

ঃ এতকাণ্ডের পর মানে ? আমি কি কখনো বলেছি তোমার ভাঙা হারটা বদলে দেব না ?

ঃ মুখে না বললেও—

ঃ তুমি তাই ভেবে নিয়েছ ?

সাধনা একটু চুপ করে থেকে বলে, হার আমি বেচে দিয়েছি।

কিভাবে কার কাছে বেচে দিয়েছে তাও সে খুলে বলে। একটু বে-পরোয়া বেশ-করেছি'র ভঙ্গিতেই বলে।

ঃ আমায় একবার জিজ্ঞাসাও করলে না ?

ঃ কেন করব ? তুমি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে হারের কোন ব্যবস্থা করবে না—

ঃ কবে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম ?

ঃ নইলে চেয়ে তো নিতে হারটা ?

ঃ তাই তো চাইলাম আজ। আজ আমার সময় আছে, সুবিধা আছে।

সাধনা ঠোঁট কামড়ায়। এই কি মানে তবে হঠাৎ তার

সঙ্গে রাখালের সহজভাবে হাসিমুখে কথা বলার? সমস্ত মনোমালিন্যের সমস্ত ভুল বোঝার দায়িত্ব সে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়?

রাখাল বলে, যাকগে। টাকাটা আছে তো? না খরচ করে ফেলেছ?

ঃ টাকা আছে। আমি ভাবছিলাম নিজে গিয়ে কিনে আনব।

ঃ সে তো আমার ওপর রাগ করে ভাবছিলে।

ঃ রাগ হবার কারণ থাকলেই মানুষ রাগ করে।

রাখাল একথা এড়িয়ে গিয়ে বলে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে শুনে পছন্দ করে আনলে কিন্তু মন্দ হয় না।

সাধনা বলে, যেমন হোক, তুমি আনলেই হবে। মিছিমিছি দু'জনের ট্রামবাসের পয়সা খরচ।

রাখাল আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তার সঙ্গে দোকানে গয়না কিনতে গেলে মিছামিছি একজনের ট্রামবাসের পয়সা বেশী লাগবে, এই হিসাব করছে সাধনা!

সাধনা তাকে টাকা বার করে দেয়। বলে, বলে দিচ্ছি শোন। ওটা ছিল তিনভরি সাত আনি—যেমন প্যাটার্ণ হোক তুমি আড়াই ভরির মত আনবে। বাকী টাকা আমায় ফিরিয়ে দেবে।

ঃ কি করবে টাকা দিয়ে?

ঃ বিপদ আপদের জন্য তুলে রাখব!

রাখাল বেরিয়ে যাবার পর বহুদিন পরে আশা আজ তার ঘরে আসে।

তাকে দেখে বোঝা যায় না এইমাত্র তার গয়নাগুলি সে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়েছে। গায়ে তার সামান্য গয়নাই থাকত, গা থেকে তাও সে খুলে দিয়েছে।

আশার দুঃখ হয়েছে না রাগ হয়েছে বুঝবার উপায় নেই। আচমকা সে যেন পড়ে গেছে এক বিষম ধাঁধাঁয়। ব্যাপারটা ভালমত বুঝে উঠতে পারছে না।

বসে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গা মানুষের মত মুখ করে বলে, এমন অদ্ভুত মানুষও দেখেছো ভাই ?

ঃ তোমাকে যেমন ভালবাসেন তেমনি ভয় করেন কিনা।

ঃ বাব্বা, জন্মে জন্মে আমার এমন ভালবাসায় কাজ নেই! ভালবাসার চোটে আমার গয়নাগুলি যেতে বসেছে।

একটু থেমে আশা বলে, তোমাদের দেখে মনে হত, বাঃ, আমি তো বেশ সুখেই আছি! বাপ্‌রে, এই নাকি সেই সুখ! চাদ্দিকে দেনা করে করে আমায় একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। রেডিও ফেডিও সব বেচে দিয়ে একেবারে আদ্ধেক করে ফেলতে হবে খরচ। মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে আমার। প্রথম থেকে বললেই হত চাল কমিয়ে দিতে হবে। গরীব মানুষ, গরীবের মতই থাকতাম!

সাধনার গলার দিকে চেয়ে সহজ সহানুভূতির সঙ্গে আশা জিজ্ঞাসা করে, গলারটাও বেচতে হয়েছে নাকি ?

: না। ভেঙ্গে গেছে, বদলাতে দিয়েছি।

বলে সে হাসে।

: বেচতে হয় তো হবে দু'দিন বাদে।

রাখালের এনে দেওয়া নতুন হার পরে সাধনা রেবার বিয়েতে যাবে। যাবে কি যাবে না দোলায় মন তার দোল খায়। একবার ভাবে, কেন যাব না? আবার ভাবে, কি লাভ হবে গিয়ে?

রাখাল বলেছে, দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে রওনা হবার কথা। তাকে বিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে সে নিজের কাজে যাবে, সন্ধ্যার পর ফিরে আসবে বিয়ে বাড়ীতে।

রেবাকে কাণপাশা দিতে হবে না সাধনার। [illegible] থেকে নাকি কিছু বাড়তি টাকা পাবে রাখাল, রেবার জন্য একটা দুল সে কিনে নিয়ে যাবে।

বাসন্তীকে নতুন হারটা একবার দেখানো উচিত ভেবে সাধনা সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার বদলে গলায় লটকে দেয়। ও-বাড়ীতে গিয়ে বাসন্তীর দিকে চেয়ে চোখে পলক পড়ে না সাধনার। গায়ে তার গয়নার চিহ্নও যেন নেই। এত গয়না সে সর্ব্বদা গায়ে চাপিয়ে রাখত যে গলার একটা হার আর হাতে শুধু দু'গাছা করে চুড়ি থাকায় তাকে যেন উলঙ্গিনী মনে হচ্ছে।

সাধনা বলে, এ কি ব্যাপার?

বাসন্তী বলে, আর বলো কেন ভাই। আমার যথাসর্ব্বস্ব গেছে।

ঃ চুরি হয়ে গেছে? কখন চুরি গেল?

ঃ চুরি নয়। ওনার সেই যে বজ্জাত পার্টনারটা মিথ্যে চাকরীর খবর জানিয়ে তোমাদের কাছে আমার গালে চুনকালি মাখিয়েছে, সেই ব্যাটার কাজ। ফন্দি করে ওনাকে একেবারে ডুবিয়ে দিতে বসেছিল।

সাধনা বলে, কিন্তু তোমার গয়না—?

বাসন্তী বলে, ওনাকে বাঁচাবার জন্য সব দিতে হয়েছে। শুধু গয়না নয় ভাই, পয়সা কড়ি সোণাটোনা যা জমিয়েছিলাম, সব ঢেলে দিতে হয়েছে। কি করি, গয়না গেলে পয়সা গেলে আবার আসবে, সোয়ামী গেলে আর তো পাব না।

নিজের হারের কথা না তুলেই সাধনা ঘরে ফেরে।

রাখাল বলে, ট্যাক্সি আনব?

সাধনা বলে, না, ট্যাক্সি লাগবে না।

কেন?

ঃ আমরা ও বিয়েতে যাব না। বেলা পড়ে এলে তুমি আমি দু'জনে ভোলার মার মেয়ের বিয়ে দেখতে যাব।

হারটার জন্য অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। নতুন হার বাক্সে তুলে রেখে সাধনা গলাটা আবার খালি করে ফেলে।

সমাপ্ত